পুজোর সময়ে

পুজোর সময়ে

বুদ্ধদেব গুহ

পূর্বাচল
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সীতা এবং চন্দ্রশেখর রুদ্র

পুজোর সময়ে

আজ রবিবার। নাস্তা করে মোটর-সাইকেল নিয়ে শিউপুরার দিকে চললো চাঁদু। মাসিমণির নির্দেশে একটি বাড়ি ভাড়া করেছে। মাসিমণির শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা আসবেন পুজোর সময়। পুজোর খুব বেশি দেরিও নেই। বাড়িটি দুমাসের জন্যে ভাড়া করে নিয়েছে ও। মাসিমণির কথামতো। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের জন্যে। অথচ এখনও কবে আসবেন না আসবেন কোনো খবর দেননি মাসিমণি। যাঁরা আসবেন তাঁদের নামই শুধু শোনা আছে মা-বাবার কাছে। যখন তাঁরা ছিলেন কখনও দেখেনি বা পরিচিত হয়নি তাঁদের সঙ্গে। তবু দায়িত্ব যখন নিয়েছে তখন.....পৌঁছলো গিয়ে এগারোটা নাগাদ। শিউপুরাতে। দারোয়ান চারজন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা। কুস্তি করে। সন্ধের সময় জম্পেস করে সিদ্ধি দিয়ে শরবত বানিয়ে খেয়ে চোখ লাল করে বসে থাকে। তখন কেউ ওদের দেখলে ভীত হতে পারে কিন্তু পবননন্দন আর রঘুপতির পূজারি ওরা মানুষ খুবই ভালো।

বাড়িটার বিরাট গেট। ঢাকা। যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়। বাড়ির সামনেই পিচ-বাঁধানো পথ। ডানদিকে গেলে এলাহাবাদ। বাঁয়ে বানারস। ডানদিকে একটু দূরেই পাছিন্দা। একটি পাহাড়ী নালা মতো আছে। বাড়ির প্রায় সামনে থেকেই, পথটা পেরুলেই উঠে গেছে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়। পাহাড়ের ঠিক মাথায় একটি বাংলো। সম্ভবত পি· ডাব্লু· ডির। বাড়িটির পেছন দিয়ে রেললাইন। যে লাইন দিয়ে ট্রেন চলে যায় এলাহাবাদ হয়ে বম্বে। অন্যদিকে বানারস, মোগলসরাই হয়ে কলকাতা।

বাড়ির মালিক অত্যন্ত অবস্থাপন্ন মানুষ। এলাহাবাদে থাকেন। বিশেষ জানাশোনা ছাড়া কাউকেই ভাড়া দেন না এ বাড়ি। প্রতিবছর যে ভাড়া দেন এবং যাকে তাকে এমনও নয়। কোনো কোনোবার নিজেও সপরিবারে এসে থাকেন। বিন্ধ্যাচলের বিখ্যাত বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির এখান থেকে মাইল পাঁচেকের পথ। পাহাড়ের উপরেও একটি মন্দির আছে। অনেকগুলি খুব খাড়া কালো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে। হনুমানদের খুব অত্যাচার। বিশেষ

করে মহিলাদের উপরে। পাহাড়ের মাথার উপরের মালভূমিটি কিন্তু চমৎকার। নানা গাছের জঙ্গল সেখানে। তবে বেশিই ঝোপ-ঝাড়। চিংকারা হরিণের একটি দল আছে এখানে। মাঝে মাঝে দেখা যায় বহু দূর থেকে। ছোট ছোট বাদামী ছাগলের মতো। দেখামাত্রই অদৃশ্য হয়ে যায় ভোজবাজির মতো। এই মালভূমিতে অনেক আশ্রমও আছে। লালরঙা লুঙি ও চাদর গায়ে লাল-লাল চোখ এবং কুচকুচে কালো গোঁফ-দাড়ি এবং মাথা ভর্তি চুলের সন্ন্যাসীদের দেখা যায়। কাপালিক কিনা কে জানে ?

চাঁদু মাঝে মাঝেই তার হণ্ডা মোটর সাইকেল নিয়ে বেগে উঠে যায় চওড়া যে পথটি আছে তা বেয়ে, তারপর পাহাড়ের মাথায় মাথায় সমতলে ঘুরে বেড়ায় শীতকালে। শুধু শীতকালেই কেন বছরের সব ঋতুতেই। এক এক ঋতুতে এক এক রূপ নেয় এই মালভূমি এবং এর বুকের ভিতরের উপত্যকা। এমন নির্জনতা এখন পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় কানওয়ালা খরগোশ আছে। তিতির, বটের। ময়ূরও অসংখ্য। সাপ আছে নানা রকম। চিতাবাঘ। ডানদিকে মালভূমির মধ্যে কিছুটা এগিয়ে গেলেই একটি উপত্যকা আছে। আদিগন্ত খাড়া নেমে গেছে মালভূমি থেকে সেই উপত্যকা মধ্যপ্রদেশের রাজবাহাদুর আর রূপমতীর মান্ডু থেকে নিমার-এর উপত্যকা যেমন খাড়া নেমেছে প্রায় তেমনই। তা বুনো শুয়োর আর নীলগাইতে ভর্তি। অন্য অনেক জানোয়ারও আছে। সেই উপত্যকার নিম্নবর্তী সমতল জমির মধ্যে ছোট ছোট টিলা আছে, বেলাভূমির কাছের বালির টিলারই মতো। প্রখর গ্রীষ্মে মালভূমি থেকে নিচে তাকালে শুকনো লাল দগদগে ঘায়ের মতো দেখায় পুরো উপত্যকাটিকে কিন্তু বর্ষার পর থেকেই তার রূপ খুলতে থাকে। পুজোর সময় থেকে শিশির পড়তে শুরু করে। সূর্যোদয়ের সময়ে ঘন সবুজ সতেজ ঘাসে আপাদমস্তক মোড়া থাকায় এবং প্রতি ঘাসের মাথায় শিশির জমে থাকায় উপত্যকাটিকে মনে হয় যেন এক হীরেরই দেশ।

এই উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে মাইল খানেক গেলে এক গরিব চাষীর বাজরা ক্ষেত। নাম তার বাজীরাও। তার বাড়িও অবশ্য পাহাড়ের মালভূমিরই এক কোণে। চাঁদু কোনো কোনো দিন তার মোটর সাইকেলটাকে পাহাড়ের উপরের বড় বড় কালো পাথরের স্তূপের আড়ালে একটি মস্ত আমলকি গাছের ছায়ায় রেখে হেঁটে নেমে যায় বাজীরাও এর ক্ষেতে। ক্ষেতের মধ্যের একটি টিলার মাথায় মাটির আর নানা গাছের ডাল দিয়ে বানানো একটি চালাঘর। দেওয়ালহীন ক্ষেতে ফসল যখন থাকে তখন শেষ বিকেল থেকে সমস্ত রাত

বাজীরাও ঐখানেই থাকে। বুনো শুয়োর আর নীলগাই আর অন্য বন্য প্রাণীদের মুখ থেকে ফসল বাঁচাবার জন্যে। দিনের বেলাতেও থাকতে হয় বেশির ভাগ সময়ে যখন মকাই ধরে। টিয়া সমেত নানারকম পাখিদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

শীতের দিনে অনেক সময় চাঁদু সারাদিনই কাটায় এই মালভূমিতে আর উপত্যকায়। কোনো কোনো দিনে ও রাতেও থেকে বাজীরাও-এর ক্ষেত পাহারা দেয়। বাজীরাও-এর বদলে। এখানে ভয় করার মতো জানোয়ার শুধু বুনো শুয়োর আর সাপ। মাথার উপরে তারা ভরা আকাশ। আর নিচে টিলায় টিলায় ঢেউ-খেলানো উপত্যকা। নেশা জেগে যায় ওর।

কলকাতার ছেলে চাঁদু। এই পাহাড়ের মাথার মালভূমি এবং উপত্যকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে ও যা আনন্দ পায় তা প্রকাশ করার ভাষা নেই ওর। হঠাৎ সামনের অদৃশ্য গর্ত থেকে খরগোশকে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে যেতে দেখে, বা প্রজাপতির ঝাঁককে উড়তে দেখে, বা নীলগাইদের ধূসর-নীলরঙা ঝাঁককে ঘোড়ার মতো টগ্‌বগিয়ে দৌড়তে দেখে ও মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এই জগতের স্বাদ খুব কম মানুষই রাখে। এমন কী রানীওয়াড়া বা বিন্ধ্যাচল বা মীর্জাপুর শহরেরও কম মানুষই রাখেন। নির্জনতা বা প্রকৃত একাকিত্বকে আজও ভালোবাসে এমন মানুষ ক্রমশই কমে যাচ্ছে চাঁদুদের পৃথিবীতে।

শিউপুরার ঐ বাড়িতে পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো ও। একবার নাকি মা ও বাবার সঙ্গে মাসিমণি এ বাড়িতে ছিলেন শীতের সময় দু মাস পুরো। মা বা বাবা আজ কেউই নেই। মেসোমশাইও নেই। শুধু মাসিমণি আছেন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঘরটর ভালো করে পরিষ্কার করে রেখেছে কিনা তাও দেখে নিলো একবার। দরজা-জানালা নিজে হাতে খুলে দিলো। বাগানে অনেক গাছ-গাছালি। নানারকম জবার ঝাড়। দুর্গা-টুনটুনি আর বুলবুলিরা শিস দিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। নদীর দিক থেকে একদল হরিয়াল তাদের আঁট-সাঁট পাখায় সাট-সাট শব্দ তুলে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। একটা ময়ূর ডাকলো পাহাড়ের উপর থেকে।

বাড়ির পেছনে মস্ত চওড়া বারান্দা। উঠোনের সামনে। পুরো বাড়িটাই পাথর দিয়ে তৈরি। এই অঞ্চল পাথরের জন্যে বিখ্যাত। শিল-নোড়া তৈরির অনেক কারখানাও আছে আশে-পাশে। দেওয়াল, মেঝে সবই পাথরের। বাইরের বারান্দাটিও খুব চওড়া। এবং উঁচু। ইজি-চেয়ার আছে অনেকগুলো বারান্দাতে।

পুরনো আমলের। হাতল লম্বা করে, পা তুলে দেওয়া যায় এমন। প্রত্যেক ঘরে তক্তপোশ এবং টেবিল-চেয়ারও আছে। ফার্নিচার বার্নিশ করা নয়। কোনোরকম আধিক্য নেই। তবে প্রয়োজনের যা, তার সবই আছে। শুধু বিছানা-পত্র সঙ্গে থাকলেই চলে যাবে। মাসিমণিকে সে কথা লিখেও দিয়েছে ও তাঁর আত্মীয়দের জানাবার জন্যে।

পাহাড়ের উপরে 'কালি-কুয়া' বলে বিখ্যাত একটি কুয়ো আছে। সেই জল যে খাবে তার পেটের সব রোগই সেরে যাবে। একেবারে ধন্বন্তরি জল। তবে নিজেদের গাড়ি না থাকলে লোক দিয়ে খাওয়ার জল আনতে হয়। এই জল আনার জন্যেই একজন আলাদা লোক রাখতে হয়। কিছু দূরেই শিউপুরা গ্রাম। সেখান থেকে ঠিকে কাজের লোক জোগাড় করে দেয় দারোয়ানেরাই। দারোয়ানেরা কিন্তু উত্তরপ্রদেশের লোক নয়। সব ভোজপুরী। বিরাট বিরাট ভুঁড়ি। মালকোঁচা মারা ধুতি। উপরে হাতওয়ালা গেঞ্জি। গরমের সময় সেই ধুতি আবার নাভির উপরে গুটিয়ে রাখে তারা। মীর্জাপুর জেলার লোকেদের মারকুট্টে বলে বদনাম আছে। ছ ফিট লম্বা সব পুরুষ। সাড়ে পাঁচ ফিটের মতো মেয়েরা। সলিড স্বাস্থ্য। প্রত্যেক পুরুষের হাতে একটি করে সাত ফিট লম্বা লাঠি। তা দিয়ে সাপ মারে, বুনো জানোয়ার মারে এবং প্রয়োজনে মানুষও মারে নাকি অবহেলায়।

সব ঘর ঘুরে-টুরে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে চাঁদু দারোয়ানদের বলে গেল যে কলকাতার বাবুরা কবে আসছেন তা জানতে পেলেই রানীওয়াড়ার কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভার বা বাস ড্রাইভার মারফত খবর পাঠিয়ে দেবে। ও তাদের জানাবে। ওর কাছ থেকে খবর পেলেই যেন দুজন কাজের লোক ঠিক করে রাখে। পুজোর সময় চেঞ্জারদের ভিড় থাকে। বিশেষ করে কালিকুয়োর জলের জন্যে আগে থেকে না ঠিক করে রাখলে লোক পাওয়া মুশকিল। বলে দিলো,ওরা একজন পুরুষ এবং অন্যজন মেয়ে। যেন অবশ্যই ঠিক করে রাখে।

কথাবার্তা সেরে মোটরবাইক নিয়ে পাহাড়ে চললো বাজীরাও-এর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলো বাজীরাও বাড়িতেই আছে। নিচের উপত্যকাতে যায়নি। খুবই খুশি হলো বাজীরাও ওকে দেখে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর গত দেড় বছরে একবারও আসা হয়নি এদিকে। আসলে ইদানিং ওর ছুটির দিনেও অন্তত ঘন্টা দুয়েকের জন্যে অপিসে যেতে হয়। এম· ডি· মিস্টার আড়ুয়ালপালকার ওঁর উপরে বিশেষ ভরসা রাখেন। রানীওয়াড়ার টাউনশিপের অনেকেরই ধারণা যে চাঁদু বছর পাঁচেকের মধ্যেই অনেককেই সুপারসিড করে

বোর্ডে চলে যাবে নিছক যোগ্যতারই কারণে। এই প্রত্যাশাতে সৎ লোকেরা পুলকিত হন। অসৎরা শঙ্কিত।

রানীওয়াড়াতে চাকরি নিয়ে প্রথমে এসেছিলো সেই উনিশশো চুরাশিতে। তখন খুবই যাওয়া হতো শিউপুরায়। বাজীরাওকে সস্ত্রীক নেমন্তন্নও করেছে চাঁদু বহুবার ওর কোয়ার্টারে। গ্রীষ্মের এবং বর্ষার বৃষ্টি না-হওয়া ভ্যাপসা রাতে এয়ার-কুলার লাগানো ঘরে রাত কাটিয়ে গেছে ওরা। ওরা বলতে, বাজীরাও আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। প্রথম পক্ষের বউটি মারা যায় চাঁদু ইংল্যান্ডে যাওয়ার দু বছর আগেই। তারপর দ্বিতীয় পক্ষর বউ আনে বাজীরাও। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। নাম মাল্‌তি। তাদের হানিমুন করাতেও নিয়ে এসেছিলো চাঁদু রানীওয়াড়াতে। বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ভোজ দিয়েছিলো। তখনই প্রথম এই উজ্জ্বল হ্যালোজেন আলো-জ্বলা পিচের রাস্তার আর হাইডাল প্রজেক্টের চকচকে শহরের এবং উত্তরপ্রদেশের ভিতরের অন্ধকারটাকে প্রথম উপলব্ধি করেছিলো চাঁদু। উপলব্ধি করে বড় দুঃখ পেয়েছিলো। নিমন্ত্রিতদের অর্ধেকেরও বেশি আসেননি। অনেক খাবার নষ্ট হয়েছিলো। বাজীরাওরা জাতে চামার। মূল বৃত্তি ছেড়ে এখন চাষ-বাসে লেগেছে। এই কারণেই উচ্চবর্ণের অনেকেই আসেননি। বাঙালীরা কিন্তু সবাইই প্রায় এসেছিলেন। ভালো লেগেছিলো ব্যাপারটা ওর। কিন্তু যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন, পরে লোকমুখে শুনেছিলো ও যে, চাঁদুর নাকি ধান্দা ভালো নয়। ঐ চামারের পরমা সুন্দরী বৌটির সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই কোনো লটর-পটর আছে। এই সব শুনে চাঁদুর মনে হয়েছিল, মুন্সী প্রেমচাঁদের লেখা দুখী চামারের গল্পর পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও ওর দেশ সেই অন্ধত্ব এবং অন্ধকারেই পড়ে আছে। খুব বেশি আলোকপ্রাপ্ত হয়নি একটা। অগণ্য থার্মাল-পাওয়ার আর হাইডাল পাওয়ার প্লান্ট যদিও হয়েছে দেশে স্বাধীনতার পর। এ আলো সে আলো নয়।

বাজীরাও-এর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মাল্‌তির ছেলে হয়েছে একটি। গর্বভরে মাটির ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে কোলে করে এনে তার ছেলেকে দেখালো বাজীরাও চাঁদুকে। পার্স খুলে একশ টাকার একটি নোট দিয়ে মুখ দেখলো চাঁদু বাজীরাও-এর ছেলের। ওরা তো অভিভূত! চাঁদু বললো, বাজীরাওকে, টাকাটা শিউপুরা বা মীর্জাপুরের ব্যাঙ্কে রেখে দেবে ছেলের নামে। বলতে অবশ্য লজ্জা করলো খুবই। টাকার অঙ্কটার সামান্যতার জন্যে। টাকা তো গত চল্লিশ বছরে কাগজই হয়ে গেছে। একশ টাকার কি কোনো দাম আছে আজকে? কিন্তু বাজীরাওদের কাছে আজকের একশো টাকারও অনেক দাম। যাদের সমস্ত

পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলেও আজকেও এক থেকে দেড় হাজার টাকাও হবে না তাদের কাছে একশ টাকা অনেকই টাকা। স্বাস্থ্য আর যৌবনই হচ্ছে ওদের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি। দুটি হাত হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূলধন।

বাইরে নিমগাছের ছায়াতে চৌপাই পেতে বসতে দিলো বাজীরাও। মাল্‌তি ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার লোটাতে করে জল আর একটু গুড় এনে দিলো। বললো, আধঘন্টার মধ্যে খানা বানিয়ে দিচ্ছে।

চাঁদুর সামনে ঘোমটা দেয় না মাল্‌তি। ওকে "দেভরজী" বলে ডাকে। বাজীরাও-এর বয়স এখন চল্লিশ-মতো হবে। পায়ে নাল-লাগানো চামড়ার জুতো। খাটো বেঁটে ধুতি। ছিটের মোটা হাফহাতা জামা। পুজোর সময় মাল্‌তিকে এবং বাজীরাওকে জামাকাপড় দেয় চাঁদু। এবার ছেলেকেও দেবে।

বাজীরাও-এর আগের স্ত্রীও খুব ভালো ছিলো কিন্তু বেচারার স্বাস্থ্য ছিলো বড়ই খারাপ। সব সময়ই হাঁপানিতে ভুগতো। কালিকুয়ো থেকে খাবার জল আনতেই হাঁফিয়ে যেতো। অবশ্য মন্দিরের মধ্যের কুয়োয় ঢোকার অনুমতি ওর ছিলো না। উঁচুজাতের লোক জল তুলে বালতি উপুড় করে অনেক উপর থেকে ওর গাগ্‌রিতে জল ঢেলে দিতো। মাসে তার জন্যে দু টাকা করে দিতে হতো। এখনও দিতে হয় নিশ্চয়ই মাল্‌তির। বাজীরাও-এর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ছিলো লছমী। সব সময় শুকনো মুখ, কৃশ শরীর। কোনো ফসলই ফলানোর ক্ষমতা তার ছিলো না। এমন কী প্রত্যেক নারীর শরীরে যে সযতনে গোপন-রাখা একটি সোনার ধানের ক্ষেত থাকে, তাতেও। জল খেতে খেতে চাঁদু বলল, দোকো বাদ বাসস্ কর না। ক্যেয়া ?

বাজীরাও হেসে বললো একহিমে বাস্‌স্ করে গা। লেড়কাই না হুয়া ! লড়কি হোনে সে ঝামেলা মচ্ যাতা থা। মাল্‌তিকো আপ সমঝাকে কহিয়ে অপারেশন করনেকি লিয়ে।

তুমি নিজে কেন করছো না ? সেটা তো অনেক সহজ। তাছাড়া তোমার এমন সুন্দরী জোয়ান বউ, সে অপারেশন করালে তোমার তো বিপদও হতে পারে !

হেসে বললো চাঁদু।

বাজীরাও হেসে উঠল। ভেতর থেকে মাল্‌তি কপট রাগের গলায় বললো, বাহ্ বাহ্ দেভরজী !

চাঁদু ঠাট্টার গলায় বললো, আরে লক্ষ্মণের মতো দেভরের সঙ্গেও সীতার নাকি

প্রেম ছিলো। দুষ্টু লোকে বলে। আর আমি তো আজকালকার ছেলে। আমাকেই বা বিশ্বাস কি ?

বাজীরাও আরও জোরে হেসে উঠলো। মাল্‌তি চুপ করে গেলো। চাঁদু বুঝলো রসিকতাটা বদ-রসিকতা হয়ে গেছে।

তারপর বাজীরাও বললো, নেহী আপনে সাহী বাত বোলা। হাম খুদহি অপারেশন করা লেগা। লেড়কা যব আয়াই গ্যয়া হামারা ঔর কৌন চিজ কা ডর ? বলে, গর্বভরে চাঁদুর চৌপায়াতে চাঁদুর পাশে কাঁথার উপরে শোয়ানো হাত-পা ছোঁড়া ছেলের দিকে তাকালো।

চাঁদু ভাবছিলো, সত্যিই তো ! এই শিশুই বাজীরাও-এর ভবিষ্যৎ। ওর তো ইনস্যুরেন্স নেই এক পয়সারও। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসান কিছুই নেই। সরকার বা বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানও বিন্দুমাত্র করবে না ওর জন্যে ও যখন বৃদ্ধ হবে, কাজ করতে অপারগ হবে। এই ছেলেই মা-বাবার সমস্ত বল-ভরসা হবে একদিন। অন্তত বাজীরাওরা ভাবছে যে হবে। কিন্তু ছেলে যখন বড় হবে তখন সে রানীওয়াড়ার মতো কোনো জনপদে কি মীর্জাপুর বা বানারস বা এলাহাবাদের মতো বড় শহরে কাজ করতে গিয়ে এই গভীব ও গ্রামীণ ভারতবর্ষের মূল্যবোধকে হারিয়েও ফেলতে পরে। যেমন হারিয়েছে চাঁদুর বাড়ির কাজের ছেলেটি। সুরজ। চাঁদু জানে যে সুরজও খুবই অভাবী বাবা-মায়ের বড় ছেলে। ওর বাবা-মা মীর্জাপুর আর বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী কোনো জায়গাতে থাকে। অন্যের জমিতে দিন-মজুরি করে, তাও পুরো বছর কাজ থাকে না। সুরজের আরও চার ভাইবোন। সুরজ চাঁদুর কাছে থাকতে পায়, চারবেলা খেতে পায়, তার উপরে পায় একশো টাকা মাইনে। দুটো বোনাসও দেয় চাঁদু ওকে। দেওয়ালির সময় আর হোলির সময়। কিন্তু একটি পয়সাও বাবাকে দেয় না সুরজ। এবং পাশের কোয়ার্টারের ব্যানার্জী সাহেবের বর্ধমানের গ্রাম থেকে আনা তরুণী বাঙালী কাজের মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছে সুরজ। প্রেমের আঁচ চোখে লাগেই, আগুনের আঁচেরই মতো ; তারপরে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলাবৃত পাথরের গায়ের অভ্রই মতো অন্য লোকের চোখের আলোতে সেই প্রেমে পড়া চোখ চকচক করে ওঠে।

সুরজকে একদিন এ নিয়ে বকবেও ভেবেছিলো ও। কিন্তু সুরজের খুবই ব্যক্তিত্ব আছে। কেতাবী পড়াশুনো আর ব্যক্তিত্ব সমার্থক নয়। কোনো কোনো মানুষ প্রখর ব্যক্তিত্ব নিয়েই জন্মায়। সুরজেরই মতো। চাঁদু সুরজকে বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য করার কথা কিছু বললে কি উত্তর পাবে চাঁদু জানে। প্রথম কথা,

সুরজ বলবে যে এটা তার "ব্যক্তিগত ব্যাপার।" দ্বিতীয় কথা বলবে যে,"বাবাকে আরও চার ছেলেমেয়ে পয়দা করতে তো আমি বলিনি। নির্বুদ্ধি বাবার ক্ষণিক আনন্দের দাম আমার সমস্ত জীবন দিয়ে আমি কেন দিতে যাবো?" ঠিক এই ভাষায় হয়তো বলবে না, কিন্তু ব্যানার্জী সাহেব তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে শুনে এরকমই একটা কিছু সুরজ চাঁদুকে বলতে পারে যে, সে আঁচ দিয়ে রেখেছিলেন। বাংলার বর্ধমানের গ্রামের মেয়ে কেতু মিসেস ব্যানার্জীর সঙ্গে অনেকই সহজে সহজ হতে পারে কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার সুরজ অত সহজে চাঁদুর কাছে সহজ হতে পারে না। যদি সুরজ এ কথা চাঁদুকে বলেই তবে যুক্তির সঙ্গে উত্তর চাঁদু দিতে পারবে না যে তা ও জানে। বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য যুক্তিনির্ভর যতটা নয়, ততটাই ব্যক্তিগত মানসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, মানবিকতাবোধনির্ভর। মানবিকতা মানুষেরই মনোপলি যদিও তবুও কম মানুষই সেই গুণকে আজ লালন করেন। তা তিনি শিক্ষিতই হোন কী অশিক্ষিত, ধনী অথবা দরিদ্র!

আটার রুটি, লাউকির তরকারি, রাঙা আলু ভাজা এবং আমলার আচার দিয়ে মাল্‌তি যত্ন ভরে খেতে দিলো চাঁদুকে। গাছতলায় বসে আরামে খেলো চাঁদু। রোদে ইতিমধ্যেই পুজো-পুজো গন্ধ লেগেছে। চিকন এই দুপুরেও না গরম না-ঠান্ডা। দারুণ এক আমেজ। বড় ভালো লাগছিলো চাঁদুর এই সুন্দর দেশের এক প্রান্তে, পাহাড়ের উপরের মালভূমিতে, তার দেশের সহজ সরল একজন গ্রামবাসীর সঙ্গে চৌপাইতে বসে ক্ষুধার অন্ন, একবেলার জন্যে হলেও ভাগ করে খেতে ভারী ভালো লাগছিলো সমান ভালোবাসায়। এতো আলো, এমন নিষ্কলুষ পরিবেশ চারিদিকে। এতো ক্লোরোফিল। আর এমন সরল, পরিশ্রমী কলঙ্কহীন চরিত্রের দুই মানুষ এই বাজীরাও আর মাল্‌তি! এই পরিবেশেরই মতো অকলঙ্ক ওরা।

খেতে খেতে চাঁদু ভাবছিলো যে ও লক্ষ করেছে শহরে এলেই, দু পাতা ইংরেজি পড়লেই গ্রামীণ ভারতীয়দের অধিকাংশই তাদের চরিত্র হারায়। কলুষিত হয়ে যায়। ভণ্ড, লোভী, অকৃতজ্ঞ, চোর হয়ে ওঠে ক্রমশই। ঐ পরিবেশে নিজেকে অবিকৃত, সৎ, সহজ, অনাড়ম্বর এবং সবল জীবনযাত্রার মধ্যে সন্তুষ্ট রাখা যেন প্রতিটি দিনের পরীক্ষা হয়ে ওঠে। কে জানে! হয়তো চাঁদুও একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। রানীওয়াড়া টাউনশিপ-এর আকাশে বাতাসে বড় লোভ। টাকা আর জাগতিক সম্পত্তি আর কোয়ার্টারের এ· বি· সি ডি-র স্ট্যাটাসই সেখানে একমাত্র বিবেচ্য, কাম্য পরম প্রার্থনার বস্তু। তাছাড়া শুনতে

পাচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই রিলে স্টেশান মারফৎ টিভি এসে যাবে। টি·ভি এলেই ভি সি আর আসবে।

মানুষের লোভ বাড়ানোর জন্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলেছে। যোগ্যতা থাক আর নাইই থাক সকলেরই সব চাই। ঘুস খেয়ে, চুরি করে, স্মাগলিং করে হলেও প্রতিবেশীর সমান হতে পারাটাই এখন জীবনের, চরিত্রের উৎকর্ষের সংজ্ঞা। সুখের অকাট্য প্রমাণ। এই টাউনশিপেই কোনো কোনো ভদ্র বাড়ির বিবাহিত অবিবাহিত মেয়েরা দেহ পসারিণী হয়ে উঠেছে শুধু আরো আরো আরো ভোগ্যপণ্যের লোভে। একা থাকলেই এই সব নিয়ে ভাবে চাঁদু। কিন্তু·····তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা ক্রমশই ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডারেরই মতো সংখ্যাতে সীমিত হয়ে আসছেন।

নানকু পানওয়ালা চাঁদুকে বিয়ে করতে বলেছিলো। রানীওয়াড়া ক্লাবে সিনিয়র অনেক অফিসারের স্ত্রীরাই এবং মেয়েরাও চাঁদুকে এলিজিবল জামাই ও স্বামী হিসেবে যে চান না তাও নয়। কিন্তু মাল্‌তির মতো চাহিদাহীন, সরল, অল্পসুখে অনেক সুখী মুখ সেই সব মেয়েদের একজনেরও নেই। সকলেই কাফকা কাম্যু গুন্টার গ্রাস আর গোল্ডিং-এর লেখা, বীটোভেন মোৎজার্ট মেনহুইনের বাজনা নিয়ে আলোচনা করেন, কন্টিনেন্টে হানিমুনে যাবার স্বপ্ন দেখেন, আমেরিকা, ইমরান খাঁ, হেমামালিনী এবং শ্রীদেবীর উপরে প্রত্যেকেই অথরিটি,সকলেই সর্বজ্ঞ।এমনই অতি-পালিশ-করা হীরের গয়নার মতো উজ্জ্বল তাঁদের ব্যক্তিত্ব, যে সব গয়না বছরে দু বছরে কোনো বিয়েতে বা পার্টিতে একবারই মাত্র পরা যায়। সেইসব গয়না চাঁদুর নিজের ঘরে নিজের খাটে একেবারেই বেমানান। অমন সব মেয়েরা পরস্ত্রী হলেই বোধহয় ভালো। তাদের সঙ্গে ফ্লার্ট এবং যদি কারো রুচিতে না বাধে তবে রাজি থাকলে পরকীয়া প্রেমও করা যায়। কিন্তু অমন মেয়েদের নিজের স্ত্রী করার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

॥ ২ ॥

মোড়টা ঘুরতেই সামনে ঝাঁজীর কোয়ার্টার। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ওঁরা। এখানে জাত-পাত এখনও এমন প্রবল যে শিক্ষিতদের অনেককেই দেখে মনে হয় যে হিন্দী আর ইংরিজির অক্ষর পরিচয়ই শুধু হয়েছে তাঁদের, প্রকৃত শিক্ষা বা ঔদার্য এঁদের স্পর্শও করেনি।

দূর থেকেই কানে ভেসে এলো গান ঝাঁজীর কোয়ার্টার থেকে। শরতের সন্ধে

হব হব বিকেলে পূর্বী রাগে গান ধরেছে বিন্দিয়া। ঝাঁজীর মেয়ে।

পথের দু পাশে সোনাঝুরি গাছেদের সারি। দিনের নিভন্ত আলো যেমন করে নরম ভালোবাসায় সোনাঝুরি গাছেদের চুলে আঙুল রেখেছে ঠিক তেমন করেই যেন বিন্দিয়া তার সুন্দর শিল্পীসুলভ আঙুলগুলি তানপুরার তারে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমাস্পদকে বলছে :

"অব্ ন করী তুম্ মোরে পিয়রবা ডাংরুগরে ফুলনকে হর বা সখিরী তনমন্ বারী....." ।

চাঁদু মোহাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। দিনের শেষ প্রহরে সন্ধেকে আবাহন করার রাগের মধ্যে দিয়ে বিন্দিয়া তার প্রেমিককেই যেন আবাহন করছে। কোমল রে আর কোমল ধৈবত-এর সঙ্গে তীব্র মধ্যম মিলে-মিশে গিয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে এমন এক অদৃশ্য ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, যে ছবির সঙ্গে নদীতীরের, নদীর উপরের শরতাকাশের এবং নদীর সূদূর অন্য পারের হলুদ আর সবুজ শর্ষে আর মটরশুঁটির ক্ষেতের নয়নাভিরাম ছবি সহ একাকার হয়ে যাচ্ছে। চাঁদুর মনে হলো প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্য সব ইন্দ্রিয়ের অবশ্যই যোগ আছে। কান নাক গলারই শুধু নয়, চোখেরও যোগাযোগ আছে যেন তাদের সঙ্গে নইলে এমন করে সমস্ত শরীর ও মনকে বিবশ কেন করে মানুষকে তেমন সৌন্দর্যের মতো সৌন্দর্য, ঘ্রাণের মতো ঘ্রাণ বা গানের মতো গান ?

তেইশ বছরের বিন্দিয়া একটি হালকা বেগুনী-রঙা শাড়ি আর গাঢ় বেগুনী রঙা ব্লাউজ পরে দু বুকের উপর দুই বিনুনি ঝুলিয়ে দিয়ে বসবার ঘরের মেঝেতে গালচে বিছিয়ে বসে তানপুরার অনুরণনে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে যেন নিজেকে পূর্বী রাগের নৈবেদ্যেরই উপচার করে এই সান্ধ্য প্রকৃতির মধ্যে। সরস্বতীর বরপুত্রী আর মদনদেবের কাঙ্ক্ষিতা বলে মনে হচ্ছে ওকে আলোকিত ঘরের খোলা দরজা আর বোগোনভেলিয়া লতাদের ফাঁক দিয়ে। এই সন্ধ্যার মধ্যে ওর সমস্ত সত্তা আপ্লুত হয়ে গেছে। ওকে, ওর গানকে আর এই সুন্দর শান্ত সন্ধ্যাকে আলাদা করে চেনার উপায়ই নেই কোনো।

আহা ! চাঁদু মনে মনে বললো, পুজোই যদি হয় তো এমনই হওয়া উচিত। আর প্রেমও তো পুজোই একরকমের। মস্ত বড় ধরনের পুজো। যে পুজোর মন্ত্র খুব কম পুরোহিতরাই জানেন।

বেচারী বিন্দিয়া !

বিন্দিয়ার জন্যে করুণা বা অনুকম্পার কারণ চাঁদুর একাধিক। চন্দ্রকান্ত ঝাঁজীর মেয়ে বিন্দিয়া যে নিম্নবর্ণের ছেলেটিকে ভালোবেসেছিলো সে চাঁদুদের

ডিপার্টমেন্টেই কাজ করতো। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার । জাতে যাদব। এইই ছিলো তার একমাত্র "খুঁত"।

ডিগ্রির কাগজ তো আলমারির ভ্যাপসা ড্রয়ারের মধ্যে ন্যাপথলিনের গুলি ঘেবা অবস্থাতে সযত্নে পাকানোই থাকে। মানুষ পণ্ডিত কি উচ্চবংশজাত তা শুধু তার ব্যবহারে, আচারে, কথাবার্তায়, আচরণেই প্রকাশ পায়। মানুষ যদি মনুষ্যপদবাচ্য না হয় তাহলে তার জাতের উচ্চতা ঘর্মাক্ত গেঞ্জির তলার উপবীতেরই মতো তার উচ্চবর্ণের এবং ডিগ্রির প্রমাণ-চাপা পড়ে থাকে। একজন মানুষের প্রকৃত মানসিক উচ্চতা তার জন্মপরিচয় দিয়ে কখনওই মাপা যায় না। যদি যেতো, তাহলে এক বাবা-মায়ের সব সন্তানের মানসিকতাই একই রকম হতো। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছিলেন "It really does not mater where do you come from sociatey. It all matter where do you go." তাই ঝাঁজীকেই অন্ত্যজ বলে মনে হয় চাঁদুর আর সেই ছেলেটি, ভরত যাদব যার নাম ; তাকে মনে হয় উচ্চতম বর্ণের মানুষ। এমনই সুন্দর তার চেহারা, ব্যবহার, বিনয়, এমনই গভীর তার বহুবিষয়ে ঔৎসুক্য। তার সঙ্গীত-প্রীতি!

বিন্দিয়ার অনেক ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিলো। বেরিলির লোক ঝাঁজীরা। বেরিলি থেকে কুড়ি বছরে হিউম্যানিটিজ-এ গ্রাজুয়েশন করে ও ওর বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিলো, ঝাঁজী এখানে বদলি হবার পর। ঝাঁজীর মতো প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাবাও তাঁর তেইশ বছরের তেজী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েকে কিছুতেই রাজি করাতে পারেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে চন্দ্রকান্তবাবুকে একা দোষ দেওয়া যায় না। এই ছোট্ট টাউনশিপের অন্যান্য উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাও বলেছিলেন যে ভরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে হয় ভরতকে গুণ্ডাদের দিয়ে খুন করাবেন তাঁরা নয়তো চন্দ্রকান্তবাবুকে সামাজিকভাবে বয়কট করবেন। উনিশশো সাতাশিতেও তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি! তবুও বিন্দিয়া যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে বিয়ে যদি কাউকে করতেই হয় তবে এ জন্মে সে ভরত ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না। জোর করলে সে আত্মহত্যা করবে।

গান-বাজনার মধ্যেই ডুবে থাকে বিন্দিয়া। বাড়ি থেকে বেরোয়ই না বলতে গেলে। চাঁদুকে "বড়ে ভাইয়া" বলে ডাকে ও এবং চাঁদু গান ভালোবাসে বলে বিন্দিয়ার সঙ্গে ওর বিশেষ একধরনের সখ্যও জন্মেছে। ভাই বোনের মধ্যের সম্পর্কের মতো এক সম্পর্ক।

বড় ভালো গান গায়, কিন্তু মেয়েটি। চাঁদু কত করে ঝাঁজীকে বলেছিলো যে

বিন্দিয়াকে এলাহাবাদের "ভাতখাণ্ডে স্কুল অফ মিউজিকে" পাঠিয়ে আরো ভালো করে গান শেখাতে। কিন্তু ভরত ছ মাস আগে এলাহাবাদেই বদলি হয়ে গেছে। অতএব এলাহাবাদ বিন্দিয়ার পক্ষে 'আউট অব বাউণ্ডস'। অন্তরা থেকে আভোগে নামছে এখন বিন্দিয়া, প্রেমিক যেমন সযতনে প্রেমিকার মসৃণ স্তনসন্ধি থেকে কস্তুরীগন্ধী নাভিমূলে মুখ নামায়।

পা চালালো চাঁদু। গানের জাদু বড় জাদু। যে জানে, সেই জানে। এখানে দাঁড়িয়ে রইলে আজ ঘরে-ফেরাই হবে না আর। পথ-চলতি লোকেও কিছু ভাবতে পারে।

দূর থেকে নানকু পানওয়ালার দোকান দেখা যাচ্ছে। অফিস ছুটি হয়েছে আধঘন্টার উপর। কিছু সাইকেল, দুটি টাঙ্গা এবং কিছু মানুষের জটলা দোকানের সামনে। তিনটি অটো-রিক্সা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নানকুর পানের দোকানের সামনে পৌঁছে গেল চাঁদু।

গিদাইয়া ওকে দেখে হাসলো। দু হাতের তেলোতে খৈনী ডলতে ডলতে বললো, ক্যা বাঙালীবাবু ? ইস্ সাল পূজাকি টাইম কলকাত্তা নেহি যাইয়ে গা ?

নদীর দিকে চেয়েছিল চাঁদু। ওর কান তখনও ভরেছিলো বিন্দিয়ার "অব্ ন করী তুম মোরে পিয়রবা ডাংরুগরে ফুলনকে হর বা সখিরী তনমন বারী"তে। পূর্বীর মতো সন্ধ্যারতির রাগ বড় কমই আছে। এতো কথা, এতো লোকজন, এতো প্রশ্ন ভালো লাগছিলো না ওর। অফিসফেরতা দু'খিলি পান খায়, তাই অভ্যাসবশেই নিজের কোয়ার্টারের দিকে যাওয়ার পথে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

গিদাইয়ার প্রশ্নর উত্তরে মুখ না ঘুরিয়েই নদীর দিকেই চেয়ে থেকেও বললো, নেহি।

কাহে ? ক্যা হুয়া ইস্ সাল ?

মুখে উত্তর না দিয়ে দুদিকে ঘাড় নেড়ে নেতিবাচক ভঙ্গি করলো ও।

বেশী কথা, কারো সঙ্গেই বলতে ইচ্ছে করে না ওর। বিশেষ করে ইদানিং। তাছাড়া উত্তর দিতে হলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। তাছাড়া সব কথা সবাইকে বলতে যাওয়াও বাতুলতা। ওর বয়সও প্রায় ত্রিশ হতে চলল। নবযৌবনের অকারণ প্রগলভতার দিন তো আর নেই। অনেকই জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে অকারণ উচ্ছ্বাসে, বাজে কথায়, বাজে আড্ডায়। তাছাড়া, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে বললেও অনেকের কাছেই অনেক কথা পৌঁছয় না। উড়ে যায়, গর্জনরত সমুদ্রের বেলাভূমির সামনের ভেঙ্গে-পড়া ঢেউয়র মাথার উপরে

চক্রাকারে ওড়া সী-গালেদের বিধুর হৃদয়-বেঁধা স্বরেরই মতো। আবার যারা যে-কথা বোঝার, তারা চোখ দেখেই ঠিকই বুঝে নেয়। মুখে কিছু না বললেও বোঝে। তবে চাঁদুর জীবনে, হয়তো সকলেরই জীবনে, তেমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম এই চিৎকৃত অধৈর্য পৃথিবীতে।

নানকু পানওয়ালা বলল, মগধী-পানে খয়ের আর চুন মেশাতে মেশাতে : "ইক্‌ঠো শাদী কর লিজিয়ে চান্দুবাবু ! এক্কেলে ক্যা জিন্দগী বিতা যাতি হ্যায় ?"

চাঁদু হাসলো। ওকেও কিছু বলল না। হাত বাড়িয়ে পানটা নিল। তারপর জর্দা। একটু পরে বলল, অব্ চলে।

ওরা সকলে নমস্কার করল। চাঁদু "ভারী অফসর" কিন্তু কোনো চাল নেই বলে এখানের সাধারণ মানুষেরা সকলেই ওকে ভালোবাসে।

একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে। গঙ্গার উপরের সুন্দর সুনীল আকাশে দিনশেষের 'ভিব্‌জোর'-এর হোরিখেলা চলছে। সূর্যের সাতরঙা রশ্মির নম্রতম পেলব রোশনাই। নদীর ঘাটের বুড়ো অশ্বত্থগাছের অগণ্য ডালপালার ঘন সবুজ পাতার আড়ালে আড়ালে নড়ে চড়ে বসতে বসতে অসংখ্য পাখি তাদের কলকাকলিতে মুখর করে তুলেছে নদীপার। সন্ধ্যা হল।

বিন্দিয়াব গানের রেশ কান থেকে মিলিয়ে যেতেই মস্তিষ্কের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি গান যেন ফুটে উঠতে লাগল ফুলেরই মতো।

সন্ধ্যা হল গো—ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধর। অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর। ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো/ ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার-মাঝে হোক না জড়ো।

আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন যায় না দেখা/ তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন সাঁজের রশ্মিরেখা/ আমায় ঘিরি আমায় চুমি, কেবল আমার বলে যা আছে মা, তোমার করে সকল হর।"

নিজের কোয়ার্টারের দিকে হেঁটে যেতে যেতে নানকু পানওয়ালার ওকে বিয়ে করতে বলার কথা মনে হল চাঁদুর। ও ভাবছিল, "আমাদের দেশে একজন পুরুষের পক্ষে সবচেয়ে সোজা কাজ হচ্ছে একটি বিয়ে করে ফেলা এবং সন্তানের জন্ম দেওয়া। সে পুরুষ কালাই হোক কী হাবাই হোক, ন্যালাই হোক, কী খ্যাপাই হোক। কালোই হোক কী ধলাই হোক, তার ন্যূনতম যোগ্যতা থাক আর নাইই থাক সমাজের সমস্তরকম জাতিগত এবং অর্থনৈতিক স্তরেই আজও মালা হাতে করে অগণ্য মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে পুরুষদের বরণ করার জন্য।"

এমন অপারগের সহজ স্বয়ংবর-সভা পৃথিবীতে আর কোন্-কোন্ প্রান্তে

আছে তা জানে না চাঁদু কিন্তু এই ভারতবর্ষে পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলে মাঝে মাঝেই বড় লজ্জা করে ওর। মেয়েদের বিনা দোষেই এমনই সহজলভ্য করে রেখেছে যে-সমাজ সেই সমাজের প্রতিও চাঁদুর এক বিশেষ ঘৃণা আছে কিন্তু তা কী করে যে প্রকাশ করবে তা বুঝে উঠতে পারে না।

ওর কোয়ার্টারটা ছোট হলেও সবরকম সুবিধাই আছে। সামনে একখানি লন। বাগান। অফিসারদের নানারকম কোয়ার্টার আছে। সি-প্লাস। সি-প্লাসের ওপর বি। তার ওপর বি-প্লাস। ওর কোয়ার্টার বি-প্লাস টাইপের। সর্বোচ্চস্তরে চেয়ারম্যানের বাংলো এবং ভি-আই-পি, গেস্ট হাউসের কোনো নাম্বার নেই। ম্যানেজিং ডিরেকটর এবং অন্যান্য ডিরেকটরদের বাংলো 'এ' ক্লাসের।

তার নিজস্ব ট্রানজিস্টারে এলাহাবাদ স্টেশান খুলে রোজই জোরে গান শোনে সুরজ এই সময়। মীর্জা আলম্-এর গজল হচ্ছে। গলা শুনেই বুঝলো। দু'বার বেল বাজানোর পর তারপর দরজা খুলল সুরজ্।

কই খত্ আয়া ?

এক্।

কোট খুলল সুরজ মনোসীলেবেল্-এ। সুরজের মধ্যে উচ্ছ্বাস, আতিশয্য কম। এত কম বয়সী ছেলেদের মধ্যে সুরজের মতো স্বল্পবাক গম্ভীর ছেলে কমই দেখেছে চাঁদু।

দরজা বন্ধ করতে করতে ও বলল নাস্তা লাঁউ ?

জারা বাদ। আজ নাহানা পড়েগা। পইলে খত্ দেকে যাও।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে অফিসের জামা-কাপড় খুলে পায়জামা নিয়ে বাথরুমে গেল। চান করে পায়জামা পরে বেরিয়ে পাঞ্জাবিটা পরে চুল আঁচড়াবে। তারপর বসার ঘরের ইজিচেয়ারে বসে চিঠি পড়বে। আজ মঙ্গলবার। মহালয়া। ভেবেছিল ভোরে গঙ্গাতে গিয়ে তর্পণ করবে। হয়নি যাওয়া। অনেক কিছুই যেমন করা হয় না। 'দেশ' আর আনন্দবাজার আসে দেরি করে। ইংরিজি কাগজের মধ্যে কিছুই রাখে না। ট্রানজিস্টারে খবর শুনেই চলে যায়। কলকাতা স্টেশনের রেডিওর খবরেই যেটুকু খবর পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ওর। আনন্দবাজার পেয়ে যায় দুদিন পর। কিন্তু শনিবারে বেরনো দেশ হাতে পায় মঙ্গলবার। আজ 'দেশ' এসেছে। কারখানার মজুরদের বেশির ভাগই মুসলমান বলে কারখানা জুম্মাবার অথবা শুক্রবার বন্ধ থাকে। তবে ওর কাজ অফিসে। অফিসের ছুটি রবিবারই।

সন্ধের পর বেশ হিম হিম ভাব এখন। রাতে পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে

হয়। এখন এখানকার মানুষদের ভাষায় "এক কম্‌লিকি" ঠাণ্ডা। ডিসেম্বরের শেষে এবং জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত তিন কম্‌লিকি ঠাণ্ডা চলে। তবে শীত যখন তুঙ্গে তখনও চাঁদু তিনটে কম্বল গায়ে দিয়ে কোনদিনও শুতে পারেনি। দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, কম্বল চাপা পড়েই মারা যাবে। দুটি কম্বল গায়ে দেয়। ঘরে একটি হিটার জ্বালিয়ে রাখে। ইলেকট্রিসিটির বিলটা কোম্পানিই দেয়। সব স্তরের কর্মচারীদেরই। বসার ঘরে ও শোওয়ার ঘরে হিটার আছে। বি-প্লাস-এর অফিসারেরা তাঁদের দু-বেডরুম বাংলোর দু বেডরুমেই এয়ার কুলারও পান। ওরও আছে। এ ক্লাসের অফিসাররা তাঁদের তিন-কামরা বেডরুমের বাংলোতে তিনটি বেডরুমেই এয়ার-কন্ডিশনার পান। রানীওয়াড়া হাইডাল প্রোজেক্ট এ সব "ফেজ" শেষ হতে এখনও ছমাস বাকি। তখন অনেক মানুষই বদলি হয়ে চলে যাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কোনো হাইডাল প্রোজেক্টে। কিন্তু চাঁদু যেহেতু মেইনটেনেন্স ডিপার্টমেন্টে আছে বাকি জীবন সম্ভবত এই হাইডাল-প্রোজেক্টটেই থেকে যেতে হবে তাকে। যে কোনো জিনিস গড়ে তোলারই মতো তাকে নতুন করে রাখা সমান কঠিন কাজ। তা বাড়িই হোক, সম্পর্কই হোক কী হাইডাল-প্রোজেক্টই হোক।

সুরজ কালোজিরে, শুকনো লঙ্কা দিয়ে বানানো বড় বড় নিমকি, লেবুর আর লঙ্কার আচার আর চা নিয়ে এসে যখন ইজিচেয়ারের পাশে রাখল তখন চাঁদুও "দেশ" ও চিঠিটি নিয়ে এসে আরাম করে বসলো ইজিচেয়ারে। পা'টা তুলে দিল মোড়ার উপরে পাতলা তাকিয়ার উপর। বসার আগে গায়ে পাতলা একটা গরম আলোয়ান জড়িয়ে বসলো। সুরজকে বলল দরজাটা খুলে দাও। দরজার সামনে দিয়েই পথ গেছে। কিন্তু সে পথ নির্জন, যানবাহনহীন। ডান দিকে একটু গিয়েই দুটি বাংলোর পরই শেষ হয়ে গেছে পথটি। অন্ধ-গলি। এখন ইংল্যান্ডে এইরকম ব্লাইন্ড লেনকে বলে "ক্লোজ"। গত বছর ট্রেনিং-এ যখন গেছিলো তখন দেখে এসেছে ও। সিনক্লেয়ার ক্লোজ, পার্ক ক্লোজ, টামব্লিং ক্লোজ ইত্যাদি সব নাম নানা অন্ধ-গলির। দরজা খোলা রাখে কারণ পথের পাশেই বিস্তৃত শাল জঙ্গল। প্ল্যানটেশন। কিন্তু বছর কুড়ি বয়স হবে। বেশ বড় হয়ে গেছে গাছগুলি। সেই শাল জঙ্গল গিয়ে মিশেছে বিন্ধ্য পাহাড়ে। এই বিন্ধ্য, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বিন্ধ্য রেঞ্জ নয়। পাহাড়টা খুব যে উঁচু তাও নয়। তবে দিগন্তরেখা পর্যন্ত লম্বালম্বি চলে গেছে কতদূর, তার খোঁজ নেয়নি কখনও। এই পাহাড়ের মাথা-সমান মালভূমি। এরই উপরে বাজীরাওরা থাকে। এলাহাবাদ ও বানারস শহর দুটির মাঝখানে এই রানীওয়াড়া। তবে দূরত্ব অসমান। রিহান্দ্

বাঁধ হাইডাল প্রোজেক্ট এবং হিণ্ডালকোর অ্যালুমিনিয়ামের কারখানাও খুব একটা দূর নয়। বাসে অথবা ট্যাক্সিতে সব জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কোম্পানির অফিসাররা ট্রান্সপোর্টও, সি-ক্লাস-এর বাসিন্দা থেকে শুরু করে উপরের সকলেই মাইল হিসাবে বিশেষ সুবিধাজনক চার্জে পান প্রয়োজন হলেই। যদিও বি এবং এ ক্লাস-এর অফিসারদের প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি আছে অথবা জীপ। কোম্পানি থেকেই দেওয়া। কারও তার উপর নিজস্ব গাড়িও আছে। তবে চাঁদু তো নিজে একটি মোটর বাইকই কিনে নিয়েছে। পেট্রোলের খরচ সামান্যই। ছুটির দিনে বা দূরে কোথাও যেতে হলে চড়ে। অফিসের দিন হেঁটেই যায় ও আসে। যাতায়াতে মাইল দুয়েক হাঁটা হয়ে যায়। ব্যক্তিগত যানে অফিসের কাজও করে প্রয়োজনে।

চিঠিটি খুলল চাঁদু। মাসীমণি লিখেছেন। কলকাতা থেকে। খামের চিঠি। বেশ ভারী।

ঁও

স্নেহের বাবা চাঁদু,

ইতিপূর্বে আমার বড় ননদের মেজননদের কথা তোমাকে লিখিয়াছিলাম। তুমি তাঁহাদের জন্যে শিউপুরায় বাড়ি ভাড়াও ঠিক করিয়া পত্র লিখিয়াছিলে। আশা করি তাঁহাদের যাত্রার বিলম্ব দেখিয়া সেই বাড়ি অন্য কেহ লইয়া লয় নাই। তাহা যদি ঘটিয়া থাকে তবে আমার মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। আমি বড় মুখ করিয়া হেমনলিনীকে বলিয়াছি যে আমার চাঁদু রানীওয়াড়ায় রহিয়াছে। বায়ু পরিবর্তনের জন্যে সিউপুরায় যাওয়াই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে।

হেমনলিনীর পরিবারের একটি লতিকা তোমাকে পাঠাইতেছি। অর্থাৎ যাঁহারা যাইতেছেন। আমি ও তোমার মেসোমশাই তো তাঁহার বদলীর চাকুরীর কারণে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে কখনই থাকিতে পারি নাই তাই তুমি আমার শ্বশুরকুলের বিশেষ কাহাকেও জান না। তাই এই পরিচয় প্রদান। তুমি তো লিখিয়াছিলে যে রামতারণ সিং-এর বিরাট বাগানবাড়িতে পাঁচটা শয়নকক্ষ এবং দুইটি প্রকাণ্ড বারাণ্ডা এবং একটি উঠান আছে। সুতরাং আশা করি উঁহাদের কোনও অসুবিধাই হইবে না। তুমি সদা-সর্বদা উঁহাদের সঙ্গ দিবে। দেখিবে যাহাতে কোনওরূপ অসুবিধা না হয়। ইহা মাতৃআজ্ঞা বলিয়া জানিবে। প্রয়োজন বিধায় কয়দিন ছুটিও লইবে।

বংশলতিকা

নীরদবরণ রায় + হেমনলিনী

(নীবদবরণ গত দশ বৎসর আগে কর্কটবোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন)

যোগেশ ও উমেশের সহিত চিত্রা ও শুক্লার এক বৎসর ব্যবধানে বিবাহ হইয়াছে। উহাদের কাহারোই এখনও কোনো সন্তানাদি হয় নাই। বিবাহ হইয়াছে মাত্র দুই বৎসর ও এক বৎসর হইল। চমৎকার পরিবার। দুই বৌ-ই অত্যন্ত সদ্বংশজাতা। উচ্চশিক্ষিতা। শুক্লা সুগায়িকা।

হেমনলিনীর কনিষ্ঠ সন্তান স্নিগ্ধা। বিশেষ করিয়া তাহার সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। বর্তমানে তাহার বয়স সাতাশ। তিন বৎসর পূর্বে তাহার বিবাহ হয়। দুই ভ্রাতা এবং হেমনলিনী যথাসম্ভব আড়ম্বরের সহিত সৎপাত্র নির্বাচন করিয়াই দিয়াছিলেন কিন্তু দেড় বৎসাবাধিক চিত্রা শ্বশ্রূগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালযে হঠাৎ একদিন চলিয়া আসে। তাহার স্বামী সত্যর সহিত আইন মোতাবেক তাহার ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। কারণস্বরূপ যাহা লোকমুখে শুনিয়াছিলাম তাহা তোমাকে সাতকাহন করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। লোকের কথায় এবং বিশেষত কেচ্ছায় তোমার মাতৃদেবীরই মতো আমারও কখনওই ঔৎসুক্য ছিল না।

বায়ু পরিবর্তন করিতে তো হেমনলিনীরা কাশ্মীর গোয়া মুসৌরী অথবা উটিতেও যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা শিউপুরার কথা আমার মুখে শুনিয়াই ঐ নির্জন অথচ স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। স্নিগ্ধার কারণেই। শিউপুরা যদিও নির্জন, কাছেই বিন্ধ্যাচল পাহাড়, বিন্ধ্যাচল, বিন্ধ্যবাসিনীব মন্দির। শিউপুরার জলের তো কোনও তুলনাই হয় না। তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকিতে ঐ স্থানে শীতকালে যাইয়া দুই মাস যে ছিলাম, সেই আনন্দ-স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে আমার মনে। দিদি জামাইবাবুর আদরের কথা কখনই ভুলিবার নহে। শিউপুরা নির্জন স্থান অথচ এক্ষণে তো তাহার অতি নিকটেই রানীওয়াড়ার মতো আধুনিক টাউনশিপ। হাসপাতাল ইত্যাদি সবই আছে। যোগেশ ও রমেশকে বলিয়াছি যে ক্লাবও আছে। তোমার মেসোমহাশয় তো তাঁহার নৈমিত্তিক সান্ধ্য পান ও ব্রিজ খেলিবার জন্যে সেখানে যাইতেনই। তোমার পিতাও মাঝে-মধ্যে সঙ্গ দিতেন। টেম্পোরারি মেম্বারশিপ

তুমি করিয়া দিতে পারো যে তাহাও জানাইয়াছি।

এখন আসল খবরটি দিই। হেমনলিনীরা পঞ্চমীর দিন সকালে হাওড়া-বম্বে মেল, যাহা এলাহাবাদ হইয়া যায় তাহাতে মোগলসরাইতে পৌঁছাইতেছে। মোগলসরাই হইতে ট্যাক্সি করিয়া সোজা শিউপুরা পৌঁছাইবে এইরূপ বলিয়াছে। পঞ্চমী এই বৎসর রবিবার পড়িয়াছে। সাতাশে সেপ্টেম্বর। রবিবার পড়িয়াছে বলিয়াই বাবা, তোমাকে অনুরোধ করিব যে তুমি মোগলসরাই স্টেশনে যাইয়া উহাদের রিসিভ করিও। কোজাগরী পূর্ণিমা এই বৎসর পড়িয়াছে মঙ্গলবারে, অক্টোবরের ছয় তারিখে। উঁহারা কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকিয়া তার পরদিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন। যদি অসম্ভব না হয় তবে সাতই অক্টোবর তারিখের যে কোনও ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিয়া রাখো তাহা হইলে নিশ্চিন্ত থাকিব। বানারস বা এলাহাবাদ স্টেশন হইতে কাটিলেও হইবে যদি মোগলসরাই হইতে না পাওয়া যায়। এলাহাবাদ হইয়া আসিলে উল্টা দিকে যাইতে হইবে উঁহাদের, ভাড়াও বেশি লাগিবে কিন্তু উপায় কী? যাহা ভালো বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে।

আমার নিজ পুত্রের উপরে যে দাবী আমি রাখি না তোমার উপরে তাহা রাখি। পুত্র-কন্যা ভাগ্য সকলের সমান হয় না। নহিলে রাহুল আর তোমার মধ্যে এত পার্থক্য কেন হইবে? হেমনলিনীর প্রিয়তমা একমাত্র কন্যাই বা ডিভোর্সী হইয়া কেন তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে বল? ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত আমাদিগের কোনও সুখই স্থায়ী হয় না। যাহা প্রত্যাশা করি তাহা পূর্ণ হয় না। অথচ তাহার ব্যাখ্যাও খুঁজিয়া পাই না।

স্নিগ্ধার মনের পরিবর্তনের জন্যেই উঁহারা শিউপুরায় যাইতেছেন কিন্তু যোগেশ এবং রমেশের স্ত্রী শুক্লা মিথ্যা করিয়া বাড়ির ডাক্তারকে দিয়া তাহাদের দুজনেরই অন্ত্রে ক্ষত আছে বলিয়া জল এবং বায়ু যেখানে প্রকৃতই উত্তম সেইরকম কোনো স্থানে যাইবার জন্যে নির্দেশ লইয়াছে। শিউপুরায় কলিকাতার পরিচিতদের সহিত সাক্ষাৎ-এর আশঙ্কা নাই। বন্ধুরাও যে প্রচ্ছন্ন শত্রু তাহা সংসারে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইলেই প্রাঞ্জল হয়। পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি ডিভোর্স-এর কারণ আমি জানি না। তুমি সদ্বংশজাত। তুমিও যে সে বিষয়ে অকারণ কৌতূহল দেখাইবে না সে বিশ্বাস আমার আছে। স্নিগ্ধা যে আদৌ ডিভোর্সী একথাও তুমি জ্ঞাত নও এমনই ভান করিবে। স্নিগ্ধার জন্যে আমারও বড়ই কষ্ট। আমার মুখ রাখিও।

বাবা চাঁদু, তোমার রূপগুণের বর্ণনা আমি তাঁহাদের দিই নাই। তবে

হেমনলিনী তোমাকে একবার আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে দেখিয়াছিলেন। সেই সময় তুমি স্কুলে পড়িতে। তুমি তো জানো যে তোমার রুক্ষ ও স্পষ্টবাদী মেসোমশাইয়ের সদা কটু মুখেরই কারণে এবং তাঁহার অপ্রিয় সত্য কথনের ঐশ্বরিক ক্ষমতাগুণে আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক আত্মীয়ের সঙ্গেই আত্মীয়তা তাঁর বর্তমানে আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। তাই তাঁর অবর্তমানে হেমনলিনীর এই দুর্দিনে তোমার মাধ্যমে তাঁহাদের এই উপকারটুকু আমি করিতে চাই। তোমার **মেসোমশাই** শুধুমাত্র দিদি জামাইবাবুকেই "জাল" নন বলিয়া মনে করিতেন।

ভালো থাকিও। যে বগলামুখী কবচ তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম তাহা সর্বদা ধারণ করিয়া রাখিতেছো তো ?

উঁহারা ভাল মতো পৌঁছাইলে আমাকে একটি পোস্টকার্ড ফেলিয়া জানাইবে।

—ইতি আশীর্বাদিকা তোমার মাসীমণি।

পুনশ্চ : তুমি একটি সাদা ট্রাউজার এবং লাল ফুলহাতা জামা পরিয়া স্টেশনে যাইও। উহাদেব চিনিতে সুবিধা হইবে। হেমনলিনী অত্যন্ত ব্যক্তিসম্পন্ন মহিলা। কালো পাড় সাদা খোলের শাড়ি পরিয়া যাইবেন। চেহারায ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। পুত্রবধূদের এবং কন্যাকে অপরূপ সুন্দরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আশা করি, চিনিতে ভুল হইবে না।

॥ তিন ॥

মাসীমণি বড় বিপদেই ফেললেন চাঁদুকে।

লালরঙের ফুলশার্ট তার একটিও নেই। ক্লাবে অনেকেই লাল-রঙা ফুলশার্ট পরে আসেন। কিন্তু তাঁদের গাড়ি আছে। মোটর সাইকেলের সঙ্গে পথের কুকুরদের এমনিতেই অহি-নকুল সম্পর্ক। কতবার যে একটুর জন্যে গোড়ালিতে কামড় খেতে খেতে বেঁচে গেছে তা চাঁদুই জানে। তাছাড়া ষাঁড়ের ভয়ও ছিল। কিন্তু লাল-রঙা ফুলশার্ট আর সাদা ফুল প্যান্ট পরে যাওয়ার আজ্ঞা হয়েছে। না-পরে গেলে মেহমানরা চিনতেও পারবেন না। অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দুবের কাছ থেকে ধার করে এনেছে একটি শার্ট। দুবের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। যে শার্টের মধ্যে অন্য আরেকজন চাঁদু অনায়াসে ঢুকে পডতে পারতো সেই শার্ট পরেই মোটর সাইকেল নিয়েই মোগলসরাইতে গিয়ে উপস্থিত হলো পঞ্চমীর দিন সকালে। ওঁরা তিনজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ। একটি ট্যাক্সিতে ধরে যাবেন। অবশ্য তাঁদের চেহারার মাপ ও জানে না। না-ধরলেও একজনকে সে মোটর

সাইকেলের পিছনে বসিয়েই নিয়ে আসতে পারে। এত সব ভেবেই মোটর সাইকেল নিয়েই গেল স্টেশনে।

থ্রী-আপ হাওড়া-বম্বে মেল ইন করার কথা মোগলসরাই স্টেশনে ঠিক সকাল সাতটা আটচল্লিশে। গিয়ে শুনলো, চল্লিশ মিনিট লেট। রেস্তোঁরাতে বসেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। সকালে শুধু এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়েছিল।

ট্রেন আসবার ঘণ্টা যখন পড়ল তখন বেরিয়ে ফার্স্টক্লাস বগি যেখানে দাঁড়ায় কুলিদের জিজ্ঞেস করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। ট্রেন এসে দাঁড়ালো। প্যাসেঞ্জাররা নামতে শুরু করলেন একে একে। চাঁদু, ইন্দিরা গান্ধীর মতো দেখতে হেমনলিনী, মাসিমণির বড় ননদের সেজ ননদের খোঁজে ইতি-উতি চাইতে লাগল। সাদা-খোলের কালোপাড়ের শাড়ি পরে নামবেন।

চিনে নিতে অসুবিধা হল না। সত্যি-সত্যিই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মুখের ও ফিগারেরও দারুণ আদল আছে। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না দীর্ঘাঙ্গী অতি সুন্দরী মহিলা। বয়স হয়তো হবে ষাট-টাট। কিন্তু দেখে তার চেয়ে অনেকই কম বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে তিন ডানাকাটা পরী। কারোই সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কে স্নিগ্ধা আর কারা চিত্রা আর শুক্লা তা কেউ না বলে দিলে জানারও উপায় নেই। সঙ্গের দুই ভদ্রলোকই লম্বা। তবে একজন ফর্সা অন্যজন কালো। শুধুই অর্থ নয়, শুধুই শিক্ষা নয়, শিক্ষা এবং অর্থ দুইয়ে মিলে কোনও কোনও মানুষের চেহারায়, হাঁটায় কথায় যে-আভিজাত্য আনে এই পরিবারের প্রত্যেকেরই মধ্যেই তা লক্ষ করে একটু অবাকই হল ও। লক্ষ্মী সাধারণত সরস্বতীর সঙ্গে সহাবস্থান করেন না। যেখানে সরস্বতী থাকেন সেখানে লক্ষ্মী এলে কিছুদিন পরই সরস্বতীকে অভিমানভরে নিঃশব্দে উধাও হয়ে যেতে দেখা যায়। সাধারণত। সমস্ত পরিবারটির মধ্যে এক নজরেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর এমন সুন্দর সহাবস্থান লক্ষ্য করে সত্যিই আশ্চর্য হল ও।

দুই ভাই বলে বোঝার উপায় নেই। ফর্সা যিনি তাঁর হাতে পাইপ। পরনে ছাই-রঙা বিজনেস স্যুট। চেহারা দেখে তাকেই বড় বলে মনে হল। অন্যজনের পরনে খদ্দরের সাদা পায়জামা আর রাজীব গান্ধীর মতো কলার-ওয়ালা পাঞ্জাবি। সাদা। গায়ে খদ্দরের জওহর কোর্ট। ফিকে সবুজ রঙা।

চাঁদু এগিয়ে গিয়ে হেমনলিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

হেমনলিনী বললেন, তুমিই আমাদের চাঁদু? সেই কতটুকু দেখেছি। ফুটবল খেলে এসেছিলে ঘেমে-টেমে তোমার মাসির বাড়িতে। কত বছর হয়ে গেল। বলেই চিবুক ধরে নেড়ে গালে চুমু খেলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বাবা!

তারপর অন্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আলাপ করিয়ে দিই ! এই আমার বড় ছেলে পগা। বলেই, কালো ভদ্রলোককে দেখালেন। আর এই আমার ছোট ছেলে ভগা। আর এই চিত্রা, পগার স্ত্রী। এ শুক্লা, ভগার স্ত্রী। আর এই যে, স্নিগ্ধা, আমার মেয়ে।

স্নিগ্ধার চোখের দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারল না চাঁদু। ওর নাম কে রেখেছিল জানে না চাঁদু কিন্তু অমন স্নিগ্ধতা··· অমন সুন্দর চোখ ও কোনো মেয়েরই দেখেনি। জীবনানন্দ, কী রকম চোখকে 'পাখির নীড়ের মতো' চোখ বলেছিলেন ও জানে না কিন্তু ওর মনে হল বনলতা সেনের সঙ্গেই যেন দেখা হয়ে গেল ওব। নাটোরের বনলতা সেন। হাত তুলে সকলকেই নমস্কার জানালো চাঁদু। তারপর তিনজন কুলির মাথায় গন্ধমাদন চাপিয়ে এগোলো গেটের দিকে।

পেছন থেকে ভগা বললেন, জামাটা কি তোমার পিতৃদেবের ? বৎস ?

চমকে উঠেই, হেসে ফেলল চাঁদু।

বলল, তা নয়, তবে অন্যলোকের তা বুঝতেই পারছেন। মাসিমার নির্দেশে পরে আসতে হয়েছে।

ভগা পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে হেসে উঠলেন। বললেন, বেচারি ! তবে কষ্টের তোমাব এই শুরু হল। আমি তাও লোক খারাপ নই কিন্তু আমার মা আর দাদা তোমার লাইফ হেল করে দেবে।

শুক্লা রাগত গলায় বললেন তুমি করে বলছো কেন ওঁকে ?

অ। তাতে কী হয়েছে ? চাঁদু ভাই, আমি সকলকেই তুমি করেই বলি। বিধানবাবুর মতো স্বভাব আমার, মানে বিধান রায়ের মতো। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি বলবে না ? কত আপন জন আমাদের চাঁদু ! বলো চাঁদু ? চাঁদুর মাসিমণির বড় ননদের সেজ ননদের ছোট ছেলে আমি ! এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে চাঁদুকে আপনি আজ্ঞে করব কোন দুঃখে ? তাছাড়া বয়সেও তো আমার থেকে ছোটো ? কি চাঁদু ?

চাঁদু বলল শুধু বয়সে কেন ? জ্ঞানে, গুণে বুদ্ধিতে সব দিক দিয়েই ছোট।

ট্যাক্সিতে উঠলেন সকলেই। ট্যাক্সির বুট ও ক্যারিয়ার মালে ভরে গেল। ভগা বললেন, তুমি কি বাবা বুটে ঢুকবে ? জায়গা কোথায় ?

আমার মোটর সাইকেল আছে।

ও ! পাইলটিং করে নিয়ে যাবে আমাদেব ? বাঃ বাঃ। এই নইলে রিসেপশন ! কিন্তু আমি ভদ্রলোকের ছেলে। আমরা সবাই যাব ট্যাক্সিতে আর

তুমি একা আগে আগে সেটা ঠিক নয়। চলো, একসময় আমি মোটর সাইকেল নিয়ে র‍্যালি করতাম। আমিই চালাব। তুমি পেছনে বসবে।

হেমনলিনী বললেন, না না। সেই কত বছর আগে চালিয়েছিস। এতদিনে ভুলে গেছিস চালানো। চাঁদুই চালাবে। তুই পিছনে বোস।

জীবনে তিনটি জিনিস একবার শিখলে মানুষ কখনও ভোলে না মা। একটি হল সাইকেল চড়া, দ্বিতীয়টি সাঁতার আর···বলেই, থেমে গেলেন।

শুক্লা বলল, রাগের গলায়, তুমি চুপ করবে?

ইয়েস। সরী।

তারপর হেমনলিনীকে বললেন আমি তোমার বড় ছেলে নই মা যে চিরদিন পরের পেছনে পেছনেই কাটিয়ে দেবো। একটা জিনিস চলবে আর তাকে আমি চালাবো না, অন্যে চালাবে, তার সওয়ার হবো আমি এমন কাজ জন্মে করিনি। চলো চাঁদু! কোথায় তোমার মোটর সাইকেল? কী সাইকেল?

হণ্ডা।

বাঃ। ফার্স্টক্লাস। চলো।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলে দিলো চাঁদু কোথায় যেতে হবে। তবুও যেন মোটর সাইকেলকেই ফলো করে ও।

মোটর সাইকেলে বসেই ভগাদা বললেন, তুমি কেবল সাফিসিয়েন্টলি আগে ডাইনে কি বাঁয়ে টার্ন নেবো তাই বলে দেবে, চলো, ওঠো। লিভ দ্যা রেস্ট টু মী। সেই ফরম্যুলা কারের বিখ্যাত ড্রাইভারের উক্তি আছে না? 'গিভ মী দ্যা মুনলাইট, গিভ মী মাই গার্ল অ্যান্ড লীভ দ্যা রেস্ট টু মী!' যাই হোক, গার্লফ্রেণ্ডও নেই, চাঁদও নেই, তবু এতেই চলবে।

নিজেরই মোটর সাইকেলে জীবনে এই প্রথম পিনিয়নে বসল ও। প্যাড্‌লে এক লাথি মেরে স্টার্ট করেই তীর বেগে ছুটিয়ে দিলেন ভগাদা মোটর সাইকেল। সাইকেল রিক্সা, টাঙ্গা, ট্যাক্সি, পাবলিক পুলিশ সকলে সভয়ে দুপাশে ছিটকে যেতে লাগল। নাঃ। ভালোই কন্ট্রোল আছে ভগাদার। এইরকম ভিড়ের মধ্যে এমন জোরে চাঁদুর দ্বারাও কোনোদিনও চালানো সম্ভব হত না। সেটা অন্য মানুষের জীবনের প্রতি মমত্ব বোধেও কিছুটা বটে। চাঁদুর নার্ভাস লাগতে লাগল।

বলল, ভগাদা, একটু আস্তে। অত জোরে চালাচ্ছেন কেন?

কারণ আছে। পরে বলব।

ফাঁকা রাস্তায় পড়তেই ভগাদা অখিলবন্ধু ঘোষের গান ধরে দিলেন: "পিয়াল

শাখার ফাঁকে ফাঁকে আধখানা চাঁদ বাঁকা ঐ/ তুমি আমি দুজনেতে বাসর জেগে রই” সঙ্গে সঙ্গে হর্ন বাজিয়ে মিউজিক। ভয় পেয়ে পথপাশের ছাগলছানা ডিগবাজি খেলো তিনবাব। একটা বয়েল গাড়ি পথ ছেড়ে দৌড়ে মাঠে নেমে গেলো আর গাড়োয়ান অশ্রাব্য গালাগালি করতে লাগলো।

ভগাদা বললেন, শালা গালাগালি দিচ্ছে না ? দিক শালা ! আমার কি ?

মাঝে মাঝেই মোটর সাইকেলটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে একবার পথের বাঁদিক একবার পথের ডানদিকে নিয়ে যেতে লাগনে উনি। বস্তির মোরগ-মুরগী কঁককঁকিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগলো। মায়েরা আরে ও গাঙ্গুয়া ! ও হাঙ্গুয়া ! বলে সভয়ে বাচ্চাদের হাঁকাহাঁকি করতে লাগল। চারধারে টোটাল কনফ্যুসন ঘটিয়ে এগিয়ে চলল মোটর সাইকেল।

দারুণ লাগে আমার, ভগাদা বললেন।

কি ?

এই সকলকে কনফিউজড করতে। যাদের হাইপারটেনশান্ আছে তাদের হাইপারটেনশন্ বাড়াতে। যাদের কনস্টিপেশন আছে তাদের তা অ্যাগ্রাভেট করে যাতে পাইলস্ হয় তা এন্‌সিওর করতে। টোটাল কনফ্যুসনের মতো এত বড় আনন্দ আর কিছু নেই। আতঙ্কও বলতে পারো। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার মতো। কি বলো ?

এত জোরে চালিয়ে এসেছেন ভগাদা যে ট্যাক্সিকে আর দেখাই যাচ্ছে না। হঠাৎ ভগাদা মোটর সাইকেল থামিয়ে দিলেন জোরে ব্রেক কষে। একটু হলেই উল্টে যেত।

কি রে চেঁদো ? ভয় পেলি নাকি ? কোনো ভয় নেই। আমি একবার হিমালয়ান র‍্যালিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। উ্য আর ইন সেফ হ্যান্ডস্।

তা থামলেন কেন ? এখনও যে অনেক পথ বাকি। গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

থাম্ তো। কেমন জিলিপি ভাজছে বল্ তো দোকানটাতে। আরে গরম-গরম সিঙ্গারা। আবার পুদিনার চাটনিও আছে। নাম্ নাম্। এই সব ছেড়ে যাওয়া যায় ?

দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে চাঁদুকেও খেতে হলো ঐ অসময়ে জিলিপি আর সিঙ্গাড়া।

ভগাদা বললেন আরো চারটে করে হয়ে যাক।

চাঁদু বলল, বলেন কী ! মরে যাব।

ভগাদা অন্যদিকে বিমর্ষ মুখে চেয়ে বলল খুবই ইচ্ছা করছিল, তুই না খেলে কি করে খাই ? তাহলে আর খাওয়া হল না।

চাঁদু অসহায়ের মতো বলল, আচ্ছা। আমি আর একটা খাব।

কোনো কথা নয়। এক যাত্রায় পেথক ফল কি বালো ?

বলেই দোকানিকে বললেন, লাগাও ভাইয়া। যেন, ফুচকাওয়ালাকে ফুচকা লাগানোর অর্ডার করছেন।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সিটা সোঁ করে চাঁদুদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েই খুব জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়জামা-পাঞ্জাবি ও জওহর কোট পরা পগাদা সামনের দরজা খুলে দোকানের সামনে এসে বললেন, কি হচ্ছেটা কি ?

দেখছিসই তো জিলিপি খাচ্ছি। এক সেকেণ্ড দাঁড়া। কিছুটা দিয়ে দি তোদের। খেতে খেতে যা।

ইতিমধ্যে স্নিগ্ধাও গাড়ি থেকে নেমে এল। কাছে এসে বলল, ছোড়দা, মা বলেছেন তুমি ট্যাক্সিতে যাবে। আমি ওঁর সঙ্গে মোটর সাইকেলে যাবো। তুমি কি ভেবেছো কি ? পরের প্রাণ না নিলে শান্তি নেই তোমার ?

ভগাদা উঠে পড়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে বললেন, পগাকে হাইপারটেনশানের ওষুধ দিয়েছিস কি একটা ?

আমার সঙ্গেই আছে। বলেই, জওহব কোটের পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে দোকানির কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়েই খেয়ে নিলেন পগাদা।

.ভগাদা বললেন, খা-খা। ওষুধ খেয়েই মর্ তুই। এর চেয়ে জিলিপি খেয়ে মবা ঢের ভালো। চল্লিশ বছরেই এই অবস্থা হয়েছে তোর এঁচড়ে-পাকামির জন্যে।

আঃ ! ভগা।

বলে, পগাদা ফিরে গেলেন।

ভগাদা বললেন, কিরে সিনু ? মা সত্যিই বলেছেন ?

সত্যি না তো কি মিথ্যে ?

তবে যাই রে চেঁদো। চৌরঙ্গীর বাড়িটা মায়ের নামে। একটু পটিয়ে না রাখলে যাওয়ার সময় পগাকেই লিখে দিয়ে যাবে। কী নোংরা পৃথিবী ! চৌরঙ্গীর বাড়ির হাফ-শেয়ারের জন্য আমার এমন আনন্দটা মাঠে মারা গেল।

চাঁদু জীবনে এই প্রথমবার একজন মেয়ের কাছে আসতেই নার্ভাস ফীল করতে লাগলো। জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছে দিশি-বিদেশী, কাছাকাছিও এসেছে অনেক, যদিও কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি তবু এমন অভিভূত

বোধ করেনি কখনও। সারা শরীরে অস্বস্তি হতে লাগল ওর। ওর মতো সপ্রতিভ ছেলেও তুতলে বলল, জিলিপি খাবেন ?

স্নিগ্ধা কথা কেটে বলল, না।

আপনি চলুন। ট্যাক্সিটাকে ওভারটেক করে তারপর আমরা আস্তে আস্তে যাবো। আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপও হয়ে যাবে।

চাঁদু উঠে বসল। স্নিগ্ধা পেছনে বসে চাঁদুর পেটের কাছটা আল্‌তো কবে ধরলো যাতে পড়ে না যায়। চাঁদুর সারা শরীরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে গেল। এমন যে হয় কখনও, হতে পারে, তা গল্প-উপন্যাসেই পড়েছিল যদিও, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করেনি।

চলুন। স্নিগ্ধা বলল।

জোরে চালিয়ে ট্যাক্সিটাকে ওভারটেক করেই স্পীড কমিয়ে পথের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগল চাঁদু।

স্নিগ্ধা বলল, বড়দার হাইপারটেনশান্ আছে। ছোড়দার জন্যেই কোনোদিন স্ট্রোক হয়ে যাবে।

ভারী মজার মানুষ কিন্তু ভগাদা।

তা মজার। তবে মাঝে মাঝে অন্যের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

একটু পরে বলল, আপনার ভালো নামও কি চাঁদু ?

চাঁদু হেসে বলল না, অর্ণব।

সে কি ? ভালো নামের সঙ্গে ডাকনামের কোনই সম্পর্ক নেই তো !

সে তো আপনার দাদাদেরও নেই। যোগেশ আব রমেশেব নাম কী করে পগা আর ভগা হয় ?

ওমা ! ওদের নামের মানে আছে যে ! হেসে বলল স্নিগ্ধা। ছেলেবেলা থেকেই দাদা একটু প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ ধরনের। প্রচণ্ড পড়াশুনা। কথায় কথায় কোটেশন ঝাড়ে। তাই প্রাজ্ঞ থেকে পাগু হয়েছে।

আর ভগাদা ?

স্নিগ্ধা হেসে উঠে চাঁদুর কোমরটা আরো জোরে জড়িয়ে ধরল।

বলল, বলছি। তারপরই বলল, আমি এই প্রথম মোটর সাইকেলে চড়ছি। স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষেই পিনিয়নে বসে আর চালিয়ে যাওয়া বোধহয় ভালো, না ? আপনার যে অস্বস্তি হচ্ছে বুঝতে পারছি কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমি বোধহয় পড়ে যাব। তাই…

মনে মনে চাঁদু বলল, চাঁদু থাকতে স্নিগ্ধাব গায়ে ধুলোও লাগতে দেবে না এক কণা।

চাঁদু বলল, বললেন না ভগাদার নামের ইতিহাস ?

ওঃ। হাসল স্নিগ্ধা। বলল ছেলেবেলা থেকেই ছোড়দাটা ওরকমই। পড়াশুনোয় কিন্তু ব্রিলিয়াণ্ট। ও তো থাকেও না এখানে। টবোন্টোতে থাকে। এবারে এসেছে শুক্লাকে নিয়ে যাবে বলে। দেশকে এত ভালোবাসে অথচ দেশ ছেড়ে যে থাকে কি করে জানি না। অবশ্য বলে যে, কিছুদিন বাদেই ফিরে আসবে।

কি করে ওখানে ?

ছোড়দা ? ওতো ইলেকট্রনিকস্-এর ইঞ্জিনিয়ার। জীবনে কোনোও পরীক্ষাতে সেকেন্ড হয়নি। দেশে কি বিদেশে। চব্বিশ বছর বয়সে কানাডাতে চলে যায় সেট্‌ল করবে বলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে।

কি নিয়ে ঝগড়া ?

সে অনেক ব্যাপার। ও ভীষণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইপের। কোটিপতি বাবার কাছ থেকে ও এক পয়সা হাত খরচ নিত না। প্রাইভেট টিউশ্যানি করে লেখাপড়া চালাত। তাতে বাবা খুব ইনসালটেড ফীল করেন এবং ওকে বলেন বাড়ি থেকে চলে যেতে। ওর এক বন্ধুর দাদার কাছ থেকে টাকা ধার করে চলে যায় কানাডাতে। বাবার মৃত্যুর আগে অবশ্য এসেছিল। বাবার হাত ধরে বলেছিল, বাবা! তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে। যে দেশ, যে বাবারা ছেলেদের সেল্‌ফ-রেসপেক্ট-এর দাম দেয় না সেই দেশ বা বাবারা ঠিক করেন না। আমি তো তোমাকে অপমান করিনি। বরং আশা করেছিলাম, তুমি আমাকে সম্মান করবে আমার অন্যরকম আত্মসম্মান জ্ঞানের কারণে। বাবা বলেছিলেন, করি রে ভগা! আই অ্যাম প্রাউড অফ অ্যু! আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

তাহলে চৌরঙ্গীর বাড়ির শেয়ারের কথা…

দূর। ওত ছোড়দার ভোগ্‌লা! ছেলেবেলা থেকে সকলকে সবসময় ভোগ্‌লা দিতো বলেই ওর ডাক নাম হয়েছিল ভগা। ছোড়দা বাবার সব সম্পত্তির অংশ বড়দা আর আমাকে লিখে দিয়েছে। ওর মতো মানুষ হয় না। শুধু বড় পেছনে লাগে লোকের। এক বছর হল বিয়ে হয়েছে, শুক্লা বেচারী রীতিমত ওর ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকে। টরোন্টো থেকে এমন সব চিঠি লিখেছে ওকে যে বেচারী কেঁদে কেঁদেই মরে। আমার ছোড়দা জীবনে কারও ক্ষতি করেনি। চেষ্টা করলেও পারবে না। আশ্চর্য মানুষ এক ও।

বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে যখন শিউপুরাতে পৌঁছনো হল তখন বাড়ি দেখে সকলে খুবই খুশি। দুজন লোক দারোয়ানেরা ঠিক করেই রেখেছিলো। রান্নার কাঠকয়লার উনুনে আঁচ পর্যন্ত বসানো ছিল। বাসনকোসন সব মাজা-ঘষা ছিল। আজকে কালিকুয়োর জল আনা হবে বিকেলে। এ বেলাটা বাড়ির কুয়োর জলেই কাজ চালাতে হবে। পগাদা ট্যাক্সিওয়ালার ব্যবহার দেখে খুশি হয়ে ওকে ডেইলি বেসিসে দশদিন রেখে দেবেন বললেন।

চাঁদু বলল, আমি কিন্তু কোম্পানি থেকে গাড়ি পাই। আজই ফিরে গিয়ে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যে কদিন থাকবেন গাড়ি সঙ্গেই থাকবে।

ভগাদা বললেন, কেন ঝামেলি করছিস চেঁদো। আমার মা কি পয়সা নিয়ে সঙ্গে যাবে ? এস্টেট-ডিউটি তুলে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে। রাজীব গান্ধী পাওয়ারে না থাকলেই আবার ফিরে আসবে। তার চেয়ে একটু খরচ টরচ হোক। মা তো আর আড়াই বছরের মধ্যে টেঁশে যাচ্ছেন না। সেরকম কোনো প্রত্যাশাই নেই। তাই গালে থাপ্পড় মেরে গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবার চেয়ে খরচাখরচ করা ভালো। পগা দেখে শিখুক একটু। মাকে বলেছি তাই,মা-জননী দয়া করে বছর দুয়েকের মধ্যে দেহ রাখো বলছি। এস্টেট ডিউটি আবার বসার আগে যদি মা টেঁশে যান তো বুঝব পগা আর সিনুকে মা রিয়্যালি ভালোবাসেন। অবশ্য পগাকে বিশ্বাস নেই। আমাদের দেশে যে যতবড় পণ্ডিত,প্রাজ্ঞ, সে ততবড় ঠগ। মাকে পগা হয়ত বিষ খাইয়েই মেরে দেবে এই আড়াই বছরের মধ্যেই, কে জানে !

পগাদা বারান্দার ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। সিগারেট ঠোঁট থেকে খুলে বললেন, চাঁদুর সঙ্গে এই তো আলাপ হল ! একটু ওভার-ডু করছিস না কি ভগা ?

এই তো আমার এভারডুয়িং। ওভার-ডুয়িং-এর প্রশ্নই আসে না।

ভগাদা এবং অন্যান্য সকলে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

পগাদা আর চাঁদু বাইরে বসে রইল। শরতের রোদে আকাশ ঝল্‌মল্‌ করছে। গাছ-গাছালি। সামনের পাহাড়। বড় শান্তি এখানে।

ভেরী ট্রানকুইল্‌। কী বলো চাঁদু ?

হ্যাঁ।

আপনি কোথায় আছেন পগাদা ?

আমাকে আমার মা পগা বলে ডাকেন। তা বলে, আই ডোন্ট এক্সপেক্ট যে সকলেই তাই ডাকুক। আমার নাম যোগেশ। তুমি যোগেশদা বলেই ডেকো। দিস প্লেস ইজ আ গুড ওয়ান ফর কনটেম্প্লেশান। পড়াশুনো করবার। কিন্তু

সঙ্গের ক্লাউনটা কি কিছু করতে দেবে ?

কে ক্লাউন ?

তুমি কি কখনও সার্কাস দেখনি ? বাফুনও বলা চলে ওকে ?

কে ভগাদা ?

রাইট উ আর।

আপনি কোথায় আছেন ?

মানে ? অ্যাট দা মোমেন্ট এখানেই আছি।

না, মানে, আপনি কি চাকরি করেন না ব্যবসা বা পেশা ?

আই স্যাম্পল লাইফ দ্যা ওয়ে আই লাইক ইট। আমি তোমার কিংবা ভগার মতো কাউকেই সার্ভ করি না। আই অ্যাম দ্যা মাস্টার অফ মাইসেল্ফ। আমি একটা কোয়ার্টারলি ম্যাগাজিন এডিট করি। পাবলিশ করি।

কি নাম ?

'আওয়ার টাইমস'। ইংরিজি।

কোথাও দেখিনি তো।

দেখবার কথা নয়। এক্সক্লুসিভ ম্যাগাজিন। মাত্র আড়াই শ' কপি ছাপি। দেশের ইন্টেলেকচুয়ালস্‌দের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করি।

ঠিক এমন সময় একটা বন্দুক হাতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ভগাদা।

বললেন, কে ইন্টেলেকচুয়ালস ? তোর ম্যাগাজিনের রীডাররা ? সব সিউডো-ইনটেলেকচুয়ালস। ফাঁকা-আঁতেল।

ভগা! দ্যাখ্‌ যেটা তোর বিষয় নয়, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস না।

কথা কে বলছে ? আমার সময়ের দাম আছে। তোর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট কে করে ? চল চেঁদো, জায়গাটা সার্ভে করে আসি। কিছু পট-হান্টিং করলে মন্দ হত না।

তা তো করবিই। ইকোলজি, এনভায়রনমেন্ট, ওয়াইল্ড-লাইফ প্রিসার্ভেশান এ সব কথা তুই শুনেছিস কখনও ? একটা আনরুলি আনসিভিলাইজড ক্রিমিন্যাল তুই।

না শুনিনি তো ! তবে অ্যাটেনবরো ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস। তাবলে ভাবিস না যে তোর ঐ ট্রাশ ম্যাগাজিনে তাকে আমি লেখবার জন্যে অনুরোধ করব। তুই পায়ে পড়লেও বলব না। সে গুড়ে বালি।

আপনার কোয়ার্টারলি ম্যাগাজিনটা কি পোলিটিক্যাল ?

নো। ইট এমব্রেসেস্‌ ওল অ্যাসপেক্টস অফ হিউম্যান লাইফ। তার মধ্যে

পোলিটিকস্‌ও নিশ্চয়ই পড়ে। অবভিয়াসলি। ফিলসফিও পড়ে।

ভগাদা বলল, চল্‌ চাঁদু। বেলা বাড়ছে। ফিলসফি! "Philosophy will clip an angel's wings!" পাগুস ফিলসফি।

বলেই, চাঁদুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েই বলল ভগাদা, বল্‌ তো কার লেখা?

পগাদা মুখ গোমড়া করে বসে থাকলেন।

ভগাদা বললেন কীটস্‌। ওরে কীটস্‌। সব লেখককে ভালো করে পড়তে হয়। কোটেশান-এর বই থেকে কোটেশন ঝেড়ে আর কতদিন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ হয়ে থাকবি? পড় পড়। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।

মোটর সাইকেলের পেছনেই বসলেন এবার ভগাদা। বললেন, নে চল্‌। পাহাড়ের ওপরটাতে কি আছে দেখি গে যাই।

পগাদা, মানে যোগেশদার খুব পড়াশুনা আছে, না? চাঁদু বলল।

বাবার ভালো লাইব্রেরি থাকলেই যদি ছেলে পণ্ডিত হত তবে আর কথা ছিল কি? পগাটা একটা রিয়্যাল হামবাগ। পড়ার মতো কিছু পড়েনি, পড়ে না। যা বিত্ত ও অঢেল সময় ও পেয়েছিল তা নিয়ে কী না করতে পারত! ওর মতো বড়লোকের ছেলেরাই বড়লোকদের গায়ে কলঙ্ক লাগায়। নইলে স্বোপার্জিত টাকায় বড়লোক হওয়া তো গর্বেরই ব্যাপার। তাতে লজ্জা কি? পগা তো কিছুই করল না জীবনে। যে-কোনও বড়লোকের ছেলেরই জুয়া-রোগ থাকে, ঘোড়া-রোগ থাকে, মেয়েছেলের-রোগ থাকে। কিন্তু হাউ ফানি! দ্যাখ,আমার একমাত্র অগ্রজকে ফাঁকা পন্ডিতি রোগে পেল! তাও বুঝতাম ফুর্তি-ফার্তা করে বাপের টাকা ওড়ায়! নিজে তো জীবনে একটি পয়সাও আয় করেনি। অথচ মানুষের একটাই মাত্র জীবন বল? হ্যাঁ! পড়াশুনা ছিল আমার বাবার। পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন কিন্তু এমন কোনও বিষয় ছিল না যাতে পাণ্ডিত্য ছিল না। আমরা দু'ছেলেই বাবার কুলাঙ্গার পুত্র। অন্য কোনও ছেলে যদি থেকে থাকে তো সে শালারা হয়তো মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। কে জানে!

মানে?

মানে আবার কি? একজন কৃতী পুরুষ মানুষ সারা জীবন একজনই মহিলার আঁচলে থাকেন? না থাকা উচিত? যদি থেকে থাকেন বাবা,তো বাবাকে স্টুপিড বলে জানব!

চাঁদুর এই দুই ভাইয়ের কথাবার্তায় ভারী মজা লাগছিল। দুইয়ের মধ্যে কিন্তু এক গভীর ভালোবাসা আছে। ফল্গু নদীর মতো। বাইরে থেকে শুধু বালি দেখা

যায়। সত্যি ভালোবাসার কত যে রকম হয়! ততক্ষণে পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে ওরা।

বাঃ! বেড়ে জায়গাটা তো! ভগাদা বললেন।

চাঁদু উত্তরে কিছু বলল না। এক একজন মানুষের অভিব্যক্তি এক একরকমের হয়। পাগুদা হলে হয়তো এই মালভূমির উপরে উঠে অন্য কিছু বলতেন।

ভগাদা আবারও বললেন, বেড়ে!

শিকার-ফিকার পাওয়া যাবে কিছু!

চলুন, বাজীরাও-এর কাছে। শিকার-টিকারের আমি কি বুঝি? কিন্তু শিকার তো বন্ধ করে দিয়েছে আইন করে দেশে। আপনি বন্দুক নিয়ে এলেন যে!

আরে বন্দুক তো এনেছি সেল্ফ-প্রোটেকশনের জন্যে। একে অসভ্য দেশ, তাই নির্জন জায়গা। সঙ্গে টাকা এবং মেয়েরা আছে। তবে একটু-আধটু শিকার করলে মন্দ কী! একসারসাইজকে একসারসাইজ, বেড়ে দৃশ্য দেখাকে দৃশ্য দেখা—তার ওপর একটু মুখ বদলানোও যাবে। মাছ সস্তা বলে দুই বৌ যে পরিমাণ মাছ গেলাবে দুবেলা যে তিন দিনেই মাছের উপর অভক্তি ধরে যাবে বুঝতেই পারছি। পগাটা হচ্ছে মাছের পোকা। ভেতো-বাঙালী। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই বাবার মতো হয়েছে। "লাইক-ফাদার লাইক-সান"।

তা আপনিও তো এক বাবারই ছেলে।

ভগাদার পাশে মোটর সাইকেল ঠেলে ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে চাদু বলল। বন্দুকটার কুঁদোটাকে বাঁ বগলে চেপে ধরে চাঁদুর পিঠে হাওয়া আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ে পাইপ ধরাতে ধরাতে ভগাদা বললেন, তা আমি কী করে জানব?

হতভম্ব হয়ে চাঁদু বলল, মানে?

আমরা দুজনে একই বাবার ছেলে কি না তা মাই একমাত্র বলতে পারেন। যৌবনে মায়ের যা রূপ ছিল। মা আমাকে যখন কনসিভ করেন তখন বাবা এতই ব্যস্ত যে মাকে পনেরো মিনিট সঙ্গ দেওয়ারও সময় ছিল না। তাছাড়া সপ্তাহের মধ্যে তিন চারদিন তো বাইরেই থাকতেন। থাকলেও রাত তিনটে অবধি জুনিয়র আর মক্কেলদের নিয়ে থাকতেন। আমার মায়ের মতো রূপসী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার প্রেমিকের অভাব পড়ার কথা ছিল না। তাছাড়া পগার সঙ্গে আমার স্বভাব-চরিত্রের এতই অমিল যে মনে হয় না, আমি আমার বাবারই ছেলে।

চাঁদু হতবাক হয়ে গেল। মানুষটাকে যতই দেখছে ততই ধাক্কা যেমন খাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তেমন আকৃষ্টও হচ্ছে তার প্রতি। এরকম লোক এর আগে চাঁদু দেখেনি। বয়সে ভগাদা তার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হবে বেশি হলে। আর

পগাদা হবে বছর সাতেকের।

চাঁদু আবার বলল, পুলিশ যদি অ্যারেস্ট করে আপনাকে আইন অমান্য করার জন্যে।

কোন্ আইন ?

বললাম না, শিকার করা মানা।

পুলিশ আগে অন্য আইন অমান্যকারীদের ধরুক। কালোবাজারী, ভেজালকারী, গুণ্ডা, বদমাস, সুইস-ব্যাঙ্কে টাকা চালানকারী, তারপরে আমাকে ধরতে আসুক। সব শালাকে জানা আছে। কেষ্টর জীব একটা খরগোস কী বুনো শুয়োর মেরে খাবো তা শালাদের কি ? আর ধরতে এলে কড়কড়ে একশো টাকার নোট ধরিয়ে দেব হাতে, দেখবি সেলাম করে চলে যাবে। আমাদের দেশের মতো সঙ্করাজ্য কি আর আছে ! যার পকেট-ভর্তি টাকা আছে তার ডোন্টকেয়ার। যে দেশে মানুষ না খেয়ে দুবেলা মরছে সে দেশের এই সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভালো নয়। প্রথম থেকে শিকারের আইন মানা হলে আজ এমন অবস্থা হত না। আর আমি তো আর রেয়ার স্পেসিস্ মারছি না। যারা পেশাদার পোচার সেই সব অর্গানাইজড দলদের ধরে না কেন ? বর্গমাইলের পর বর্গমাইল জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর, তখন কী করে ? বজ্র-আঁটুনি ফসকা গেরো। সম্ভব হলে শালার নেতাদেরই মারতাম। একটা খরগোস বা শুয়োর মারার প্রস্তাবেই তোর এত কথা।

একটু দম নিয়ে বলল, কই ইংরেজদের আমলে তো কারো সাহস ছিল না কোনও আইন ভাঙ্গার ? তখন তো দূর থেকে ভুঁড়িওয়ালা লাল পাগড়ি দেখেই ভয়ে কুঁকড়ে যেত দেশের লোক ! আসল ব্যাপারটা কি জানিস চেঁদো ? স্বাধীনতা পাওয়া ও স্বাধীন থাকার যোগ্যতা আমাদের নেই। দেশের মানুষই দেশকে গড়ে তোলে। মানুষের মড়ক লেগেছে। মানুষের মতো মানুষের।

চাঁদুর গুলিয়ে গেলো যে ভগাদাই পগাদা না পগাদাই ভগাদা ! জ্ঞান তো ভগাদাও কম দেয় না দেখছে।

বাজীরাও ঘরের বাইরের উঠোনে বসে কী যেন করছিল। দূর থেকে চাঁদুদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। চৌপাই বের করল ঘর থেকে। হাতজোড করে নমস্কার করলো ভগাদাকে বাজীরাও।

চাঁদু বললো, হামারা এক বড়ে ভাইয়া। কলকাত্তাসে আয়া।

আর ভগাদাকে বলল, এ হচ্ছে বাজীরাও।

মাল্‌তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল চাঁদুর গলা শুনেই। বেরিয়ে এসেই, ভগাদাকে

দেখে এক হাত ঘোমটা টানল হাতের বালা রিন্‌ঠিনিয়ে।

সপ্রতিভ ভগাদা বললেন, অমন সুন্দর খোমাটা আমাকে দেখাবে না গো ঘোমটা খোলো। ঘোমটা খোলো।

বলেই, চাঁদুর দিকে ফিরে বলল, ফার্স্ট ক্লাস মাল তো রে। তোর সঙ্গে ইয়ে-টিয়ে আছে নাকি ?

ভাগ্যিস বাজীরাও বাংলা বোঝে না। তবু চাঁদু তাড়াতাড়ি বলল বাজীরাওকে, আরে আমার বড় ভাইয়ার সামনে মাল্‌তির এতো লজ্জা করতে হবে না।

বাজীরাও মাল্‌তিকে ঘোমটা খুলতে বলল। মাল্‌তির মুখ, গ্রীবা, কপাল, চোখ, চুল এক ঝলক দেখে নিয়েই ভগাদা বলল, সত্যজিৎ রায় স্মিতা পাটিল মরে গেল বলে কী একটা ছবি করবেন না বললেন। এ মেয়ে বম্বে গেলে তো রেখা এবং শাবানা আজমী দুজনেই না-খেয়ে মরবে র‍্যা। এর মধ্যে রাস্টিক সৌন্দর্য এবং আর্বান সফিস্টিকেশন যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে আছে র‍্যা চেঁদো। কী দেকালি শাইরি তুই !

উপমা শুনে চাঁদুর তো অজ্ঞান হবার অবস্থা হল। ক্রমশই ভগাদার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে ও।

বন্দুক দেখে বাজীরাও বলল, ওর মকাই ক্ষেতে যদি বাবু বসেন তাহলে নির্ঘাৎ শুয়োর 'পিটা' যাবে। বন্দুকের শব্দে অন্যরা ভয়ও পাবে,কিছুদিন ওদিক মাড়াবে না। এবং অনেকদিন পর শুয়োরের মাংসও খাওয়া যাবে। বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের বন-জঙ্গলের মানুষদের কাছে শুয়োরের মাংসের মতো স্বাদু আর কিছু নেই।

বলেই, চাঁদুকে জিজ্ঞেস করল, বড়ে ভাইয়ার হাত কেমন ? এখানেই দশ বছর আগে এক শিকারী এসেছিল। তাকে নিয়ে গেলাম তিন কোশ হাঁটিয়ে খুব ভালো জায়গাতে শম্বর মারাতে। সে মেরে বসল গ্রামের প্রধানের ঘোড়া। চাঁদনী রাত ছিল। কোনওক্রমে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

বাজীরাও-এর ঠেঁট দেহাতী উত্তরপ্রদেশীয় হিন্দী ভগাদা বুঝল না। টেলিভিশনের হিন্দীর সঙ্গে বিহার উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের সাধারণ মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে তার কোনোই মিল নেই। ভারত সরকারের হিন্দী এক চাপানো, বানানো ভাষা। সে ভাষায় দেশের কোনো সাধারণ মানুষ কথা বলে না। হিন্দী বুঝতে না পেরে ভগাদা বলল, বল্টো কী তোর শিবজীরাও ?

চাঁদু বলল, বাজীরাও।

ছাড়তো ! বাজীরাও কারো নাম হয় না কি ? ওকে আমি শিবাজীরাওই বলব। কেমন দুর্গের মতো পাহাড়ের ওপরে থাকে ! এতদিন যে ওর নামটা তুই কেন বদলাসনি তা জানি না।

চাঁদু বলল, ও জিজ্ঞেস করছে বন্দুকের হাত আপনার কেমন ? একজন শিকারী নাকি শম্বরকে তাক করে এক গাঁয়ের প্রধানের ঘোড়াকে মেরে দিয়েছিল। সেইজন্যেই চিন্তিত।

ভগাদা একমুহূর্ত ক্রিটিক্যালি চাঁদুর ও বাজীরাও-এর মুখে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, শিকার বলতে আজ পর্যন্ত দেশের বাড়িতে দুটি বগা, একটি পানকৌড়ি এবং একটি বুড়ো ঢ্যামনা সাপ মেরেছি। সবই ছররা দিয়ে। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, হাত আমার মোটেই ভালো না। কিন্তু কপাল খুবই ভালো। একবার পাগুর সঙ্গে জোর ঝগড়া হওয়ায় দেশের বাড়িতে ওকে গুলি করে দিয়েছিলাম বুলেট পুরে বন্দুকে।

চাঁদুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো কথা শুনে।

তারপর ?

তারপর আর কি ? গুলি পগার বুকে না লেগে কাঁটালগাছের উঁচু ডালে এমন জায়গাতেই লাগল যে মা সকাল থেকে যে মস্ত পাকা কাঁঠালটি পাড়তে বলেছিলেন বংশীকে, মানে দেশের বাড়ির কাজের লোকটিকে, সেই কাঁঠালের বোঁটায় লাগল গুলি। ধপ্পাস করে মাটিতে পড়ল কাঁটাল। পগাকে বললাম, লুক! উ আর নট ইভিন ওয়ার্থ আ জ্যাকফ্রুট। আমি তখন ফারস্ট ইয়ারে পড়ি। সেই যে প্রাণে বেঁচে গেলো তারপর থেকেই পগার সাহস অত্যন্ত বেড়ে গেছে। কোনোরকম ঝগড়া হলেই বুক-চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে গুলি করবি তো তুই ? প্রি-হিস্টরিক এবমিনেবল্ এপ্ ; কর্ গুলি। আসলে, ও ভালো করেই জেনে গেছে তো যে গুলি লাগবে না তাইই এত লম্ফ-ঝম্ফ। একদিন সত্যিই যদি লেগে যায় তো বুঝবে বাছাধন।

তা খামোকা দাদাকে গুলি করতে যাবেনই বা কেন ?

আরে ও একটা বুর্জোয়া, বুলি-সর্বস্ব, নগর-কেন্দ্রিক ইডিয়ট্। ওদের না মারলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওকে মেরেই বিপ্লব শুরু করব আমি।

তারপরই গলা নামিয়ে বলল, কবে সাবড়ে দিতুম। পারি না কেবল ওর বৌটার জন্যে। এত ভালো মেয়ে না চিত্রা। মাঝে মাঝে আমাকে চুমুটুমুও খায়। একদিন আদর করতেও দেবে বলেছে। বড় আদর। পগাটাকে বলি যে এভরি

অলটারনেট উইক-এ ওয়াইফ সোয়াপিং কর। বোরড্ ফীল করবি না কখনও জীবনে। তা কি ইডিয়টটা শোনে। ভ্যারাইটি ইজ দ্যা স্পাইসেস্ অফ লাইফ। কী বল চেঁদো ?

চাঁদুর মাথার গোলমাল হবার উপক্রম হচ্ছিল। এ কী উন্মাদদের মাসিমণি পাঠালেন তাঁর কাছে ? বাজীরাও-এর প্রশ্নর উত্তর প্রাঞ্জল না হওয়াতে চাঁদু আবার মূল প্রশ্নে ফিরে গেল। বলল, বাজীরাও জিজ্ঞেস করছে...

ভগাদা বলল, শিবাজীরাওকে জিজ্ঞেস কর তো শুয়োর কি একটা আসে ? বড় দাঁতাল ? না দলে ?

বাজীরাওকে শুধিয়ে চাঁদু বলল মস্ত বড় দল। ধাড়ি, মাদি, বাচ্চা।

বাঃ ! ফাস্টোকেলাশ। তবে ওকে বল্ যে শুয়োর মেরে দেব। দলে এলে প্রবলেম নেই। "জেনারেল ডিরেক্শানে" এইম করে টেনে দেব ট্রিগার। একটা না একটা পড়ে যাবেই।

চাঁদু বলল, আহত হয়ে যদি চার্জ করে তোমাকে ?

নির্লিপ্ত ভগাদা বললেন, সে আমি বুঝব। একসঙ্গে একাধিক ইভেনচ্যুয়ালিটির কথা কখনও ভাবতে নেই। ট্যাকল্ ওয়ান প্রবলেম্ অ্যাট আ টাইম। এইটে করা হয়নি, হচ্ছে না বলেই ইন্ডিয়ার প্রগ্রেস হচ্ছে না, বুয়েচিস ?

চাঁদু মাথা নাড়লো।

বাজীরাও সবিনয়ে শুধলো চাঁদুকে দুপুরের খাওযাটা কি এখানেই ?

চাঁদুর জন্যে অপেক্ষা না করে ভগাদা বললেন আলবাত। লাঞ্চ হিয়ার। রেস্ট দেয়ার আফটার। দেন প্রসীড টুওয়ার্ডস দ্যা হান্টিং স্পট। চাঁদু বলল, তা মাসিমা, বৌদিরা এবং পগাদা তো আর এ কথা জানে না। আজকে ফিরে চলুন। পরে যে-কোনও দিন আসা যাবে। দশদিন তো থাকছেন। আপনার সঙ্গে আমিও থাকব। আজ সপ্তমীর দিন। রানীওয়াড়া ক্লাবের পুজো প্যাণ্ডেলে একবার যেতেই হবে আমাকে। বৌদিরা, মাসিমা সকলেই তো যাবেন বলেছেন।

যাবি তো যা। তুই চলে যা। ভগা রায় কোনওদিনও কোনও ব্যাপারে অন্য কোনও শালার উপর ডিপেন্ড করেনি। সকলে যেখানে যায়, যা করে ভগা রায় সেখানে যায় না তা করে না। আমার কথা মাকে আর ওদের বলে দিস। সী উ টুমরো ! তুই একটা মুখ্যু। তুই যা। শিবাজীরাওকে বলে যা যেন সাইন ল্যাঙ্গোয়েজে আমার সঙ্গে কথা বলে। এবং ওর ওয়াইফকে বলে যে আমার সামনে একমুহূর্তের জন্যেও যেন ঘোমটা না দেয়।

কী করছেন ভগাদা। প্লীজ আমার এই কথাটা রাখুন। আজ ফিরে চলুন।

বলেই বাজীরাওকেও অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে ইশারা করলো।

বাজীরাও বলল, আজকে আমাকেও একবার ছেলেটাকে নিয়ে বিন্ধ্যাচলে কবিরাজের কাছে যেতে হবে। আজ না হলেই ভালো হয়। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হবে।

ভগাদা কী ভাবলেন এক মুহূর্ত। তারপর বললেন, যে কারণেই হোক তোকে আমার পছন্দ হয়েছে চেঁদো। তুই মেয়ে হলে তোর সঙ্গে শুয়েও পড়তে পারতুম। চল আজ ফিরেই যাই। তুই যখন বলছিস !

॥ চার ॥

পুজো মণ্ডপে এসেই পগাদা এবং ভগাদার মা হেম-মাসিমা একশ টাকা চাঁদা দিলেন।

পুজো কমিটির অনারারি সেক্রেটারি কল্যাণ গুহ রায় খুবই খুশি। বললেন, আপনি চাঁদুর মাসিমা। আমাদেরও মাসিমা। দুপুরে শুধু আজ নয় রোজই ভোগ খাবেন। রাতে সন্ধ্যারতি দেখতে আসবেন। দশমীর দিন আমরা প্রতিমা বিসর্জন দেব। একাদশীর দিন বিজয়াসম্মিলনী হবে। চাঁদুও গান গাইবে কথা আছে। আরো অনেকে গাইবেন। বিন্দিয়া ঝাঁ গাইবে। আমাদের রানীওয়াড়ায় লোকাল ট্যালেন্টের অভাব নেই। তারপর বললেন, মাসিমা, আপনার পরিবারের মধ্যে যদি কেউ কিছু করতে পারেন তাহলে বলুন। তাঁর নাম লিস্টে ঢুকিয়ে নেবো। ফাংশান আরম্ভ হবে কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায়। গান আবৃত্তির পর এখানে স্টাফেদের যে অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাব আছে সেই ক্লাব 'সাজঘর' একটি ছোট্ট নাটক মঞ্চস্থ করবে।

চাঁদু বলল, হেম মাসিমা, সেদিন অত রাতে আপনাদের আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই। আমার পর্ণকুটিরেই খাওয়া-দাওয়া করে পরদিন ব্রেকফাস্ট করে একেবারে যাবেন। হেম মাসিমার আপত্তি ছিলো তাতে। বললেন, আমরা এতজন লোক তোমার অসুবিধা হবে।

কিছু অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমি দ্বাদশী থেকে লক্ষ্মীপূর্ণিমা অবধি ছুটি নিয়ে ঐ ক'দিন আপনাদের সঙ্গেই না হয় কাটাবো। মাসিমণির নির্দেশ।

ভগাদা বললেন, শুধুই খাবার খাওয়াবি চেঁদো ? শুনেছি আজকাল দিশি হুইস্কি পাওয়া যাচ্ছে ভালো ভালো। খাওয়াবি তো ?

পগাদা এই একবার ভাই-এর সঙ্গে সোৎসাহে একমত হলেন। বললেন, এ কথাটা মন্দ বলেনি ভগা।

ভগাদা বললেন মন্দ কথা ভগা কখনও বলেনি। আর শুনুন কল্যাণবাবু আমার বোন স্নিগ্ধা খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গান গায়। ও গাইবে।

স্নিগ্ধা বললো, একদম না। আমি স্টেজে গাইবার মতো গাইয়ে হইনি এখনও। হলেও, স্টেজে গাইবো না।

চাঁদু বললো, ঠিক আছে তাহলে আমার বাড়িতেই হবে আপনার গান। বিন্দিয়াকেও বলবো। আর কল্যাণদা তুমিও এসো। সেদিন বৌদিকে নিয়ে। একটু গান-বাজনা হৈ-চৈ হবে। অষ্টমীর রাতে।

ভালো কথা। তোর বৌদি তো চাঁদু বলতে অজ্ঞান। এক বাক্যে রাজি হয়ে যাবে।

ভগাদা বললেন, সকলেই চাঁদু বলতে অজ্ঞান হলে তো এখানে চাঁদুর কারণেই আলাদা হাসপাতাল খুলতে হবে দেখছি।

বিন্দিয়া অঞ্জলি দিয়ে এগিয়ে এলো। আও, বহিন্ আও। বলে, চাঁদু সকলের সঙ্গে বিন্দিয়ার আলাপ করিয়ে দিলো। বিন্দিয়া হেমনলিনীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। ঝাঁজী ব্যাপারটা দূর থেকে দেখলেন। চাঁদুরা কায়স্থ। কায়স্থকে ব্রাহ্মণের মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা বোধ হয় ওঁর মনঃপূত হলো না। ঝাঁজীকেও ডেকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো চাঁদু।

বড় সাহেব আড়ুয়ালপালকার মারাঠী। তাঁর স্ত্রী ও তিনিও অঞ্জলি দিতে এসেছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আড়ুয়ালপালকার সাহেবের ঔদার্যের কারণেই পুজোর সময়ে কেউই জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারেন না। বড়সাহেবের মতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস কারোই নেই। এর আগে উচ্চবর্ণেরা একটি আলাদা পুজো করতেন এবং নিম্নবর্ণেরা অন্য। উনি এসে তা বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন রানীওয়াড়ার প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মীয়। (গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, যেই আত্মার কাছে থাকে, সেই হচ্ছে "আত্মীয়"।) রানীওয়াডায় আমরা সকলেই সকলের আত্মীয়। এখানে জাত-ফাতের বিচার পুজোর সময় অন্তত আমি করতে দেবো না। মায়ের পুজো সকলেই একসঙ্গে করবে।

বিন্দিয়া ওদের মধ্যেই বসলো ডেকরেটরের হলুদ-রঙা চেয়ারে। একটি জংলা কাজের সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি পরেছে ও। একবিনুনি করেছে। মেয়েদের নতুন শাড়ি-ব্লাউজের গন্ধ, চান করে ওঠা ভেজা-চুলের তেলের এবং নানারকম পারফ্যুমের গন্ধের সঙ্গে ধূপ-ধুনোর গন্ধ এবং নৈবেদ্যের জন্যে কাটা মিশ্র-ফলের

গন্ধ মিলে মিশে গেছে। নেশা-নেশা লাগে চাঁদুর পুজোর এই তিনদিন।
স্নিগ্ধার সঙ্গে কথা বলছিলো বিন্দিয়া। ইংরিজিতেই বলছিলো, কারণ স্নিগ্ধা ভালো হিন্দী বলতে পারে না। ভালো হিন্দী ওঁরা কেউই বলতে পারেন না। লিঙ্গ নিয়ে যেমন গোলমাল তেমনই উচ্চারণ নিয়ে। আড়ুয়ালপালকার সাহেবও ইংরিজিতেই কথা বলেন সকলের সঙ্গে। তবে যাঁরা ইংরিজি বোঝেন না তাঁদের সঙ্গে অবশ্য হিন্দীই বলেন। মারাঠী অ্যাকসেন্টে। তবে লিঙ্গের ভুল হয় না। হিন্দী শিখতে হয় সব সরকারী অফিসারদের। অফিসে বোর্ডও টাঙানো আছে "সরকারী কাম-কাজ হিন্দিমে কিজিয়ে।" কিন্তু অফিসিয়াল চিঠি-চাপাটি সব ইংরিজিতেই চালাতে হয়। কারণ দক্ষিণ ভারতীয়ও অনেকে আছেন। তাঁরা বাঙালীদের মতো দোনা-মনা করেন না এ ব্যাপারে। হিন্দীতে কথা বললেও লেখালেখি কখনওই হিন্দীতে করেন না।
একাদশীর দিন ডিরেক্টর নটরাজন সাহেবের স্ত্রী কর্ণাটকী গান গাইবেন। সুব্রাহ্মনিয়ম্-এর মেয়ে বাজাবে মৃদঙ্গম। সব মিলে বেশ একটা সর্বভারতীর ব্যাপার। ভারত যে একই দেশ, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যাই-ই ভাবুন, তা চাঁদুদের রানীওয়াড়ার পুজোতে এলেই বোঝা যায়। সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে অনেক গোর্খা আছে। সাপ্লায়ার এবং অফিসারদের মধ্যেও অনেক শিখ আছেন। খবরের কাগজে গোর্খাল্যান্ড আর খালিস্তানের যে দাবির কথা ওরা পড়ে তার কোনো ছোঁয়া উত্তরপ্রদেশের এই রানীওয়াড়াতে লাগেনি। লাগেনি, আড়ুয়ালপাল্কার সাহেবের জন্যেই। মুসলমানদের মুহাররম্ ও বক্‌রি ঈদের সময়ও সন্ধেবেলায় শমিয়ানার নিচে জমায়েত হন সকলে। মুশায়রা হয়, গজল হয়, বড় বড় কবিদের নেমন্তন্ন করে আনা হয় এলাহাবাদ ও বেনারাস থেকে। তাঁরা ভালো ভালো শায়রী শোনান। প্রথম বছর নাকি এলাহাবাদ থেকে ফিরাখ্ গোরখপুরীকেও আনা হয়েছিলো। তখন এম ডি সাহেব ছিলেন কুমার সাহেব। হরিয়ানার লোক। পাঞ্জাবী ভাষাটার সঙ্গে উর্দু ভাষা বেশ মিলে মিশে যায়। অনেক শিক্ষিত পাঞ্জাবীই ভালো উর্দু জানেন।
বিন্দিয়া একটু পরে উঠে গেলো, চলে 'বড়ে ভাইয়া' বলে।
স্নিগ্ধা বললো, ভারী মিষ্টি মেয়ে।
চাঁদু বললো, গান শুনলে প্রেমে পড়ে যাবেন।
স্নিগ্ধা বললো, আমি মেয়েদের প্রেমে পড়ি না। ভালো লাগা পর্যন্ত ঠিক আছে।
চাদুর সঙ্গে বিভিন্ন অফিসারের সুন্দরী স্ত্রী এবং কন্যারা যেমনভাবে দৌড়ে

দৌড়ে এসে কথা বলছিলেন তা চোখের কোণে লক্ষ করছিলো স্নিগ্ধা। চিত্রা এবং শুক্লাও।

শুক্লা বললো, বাবাঃ। আপনি দেখছি রানীওয়াড়ার লেডি-কিলার।

ওরা সকলেই হেসে উঠলো সে কথাতে।

চাঁদু বললো, একজনকেও তো পারলাম না কিল্ করতে।

ভগাদা বললেন, চেঁদোর আমাদের, রুচিটা আর নজরটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের উঁচু। এই কারণেই ওর কোনোদিন বিয়ে করা হবে না।

হেমমাসি বললেন, আহা। কীই বা বয়েস ওর। দিন যেন চলে গেছে। মনের মতো কাউকে পাবে না তা কি হয়?

স্নিগ্ধা বললো, সেই হচ্ছে আসল কথা। চোখে তো ভালো কত লোককেই লাগে। মনে যদি না ধরে তবে কি আর প্রেম হয়?

চাঁদু বললো, নিধুবাবুর একটি টপ্পা আছে ঠিক ওই বিষয়ের উপর। দারুণ গান।

শোনান। শোনান। শুক্লা বলে উঠলো।

স্নিগ্ধা কিছু বললো না। চেয়ে রইলো চাঁদুর মুখে। স্নিগ্ধার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চাইতে পারে না চাঁদু। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। এমন অসুখ তার কোনোদিনও ছিলো না। স্নিগ্ধা ফর্সা নয়। গঙ্গার কালো পারের সাদা চরের মধ্যবর্তী অংশে যে পেলব মসৃণ উজ্জ্বল একরকম না-কালো না-সাদা আস্তরণ পড়ে, জল আরম্ভ হবার আগে; স্নিগ্ধার গায়ের রঙ অনেকটা সেই রকম। দুটি চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন মাখামাখি হয়ে আছে। দাঁতগুলিও ভারী সুন্দর। পাতলা ফিনফিনে ঠোঁট। ঠোঁটের কাছে এবং গলায় তিল আছে। ও যেন ওর চোখ পুরো খোলে না। সবসময় কেমন স্বপ্নাতুর আধ-খোলা চোখে চেয়ে থাকে। আর যখন হেসে ওঠে তখন চাঁদুর মনে হয স্রোতে বেয়ে আসা কাঠ-কুটো খড়কুটোর স্তূপে পাহাড়ী নদীর কোনো ধারা অনেকক্ষণ রুদ্ধ হয়ে থাকার পর যেন হঠাৎ মুক্তি পেয়ে কলকলিয়ে কালো পাথরের উপরে উপরে কোজাগরী পূর্ণিমার গলে-যাওয়া জ্যোৎস্নার মতো ধেয়ে যাচ্ছে নিমেষে। সব কিছুই যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই স্রোতে। গর্ব, রূপ, গুণ, সুরুচির দম্ভ, সংযমের বাঁধ। এতদিনে প্রেমে পড়ার মতো একজন মেয়ের দেখা পেয়েছে চাঁদু। কিন্তু প্রেমে পড়া খুব আনন্দের ব্যাপার বলে ভেবেছিলো। তা যে এত কষ্টের ওর জানা ছিলো না। এত কষ্ট। ওর আজকাল খেতে ভালো লাগে না, ঘুম আসে না, কাজে মন বসে না, কেবলই মনে হয় শিউপুরায় চলে যায়।

স্নিগ্ধার একটু কাছে কাছে থাকে। ওর হাতের আঙুলগুলি, মাথার চুল, কোমর-ছাপানো ; ছোট্ট কিন্তু পরম শান্তশ্রীমণ্ডিত কপালটুকু ওর না-তীক্ষ্ণ, না-ভোঁতা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নাক ও চাঁচরের আগুনের শিখার মতো চিবুকের দিকে তাকালে চাঁদুর মতো ছেলেরও বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে। পুরুষ যে যতবড় রূপবান, যতবড় গুণী, যতবড় যশস্বী ও অর্থবানই হোক না কেন, কেন যে যুগে যুগে মেয়েরা তাদের উপর দখল নিয়েছে তা যেন এ'কদিনে চাঁদু বুঝতে পারছে। রানীওয়াড়ার বেশির ভাগ কুমারী মেয়ের দিকে চাঁদু একবার তাকালেই তারা গলে যায়। বিবাহিতরাও যান। কিন্তু প্রায় একশ জন পরমা সুন্দরী মহিলা এখানে থাকা সত্ত্বেও ওর মনে কারো প্রতি এরকম ভাব জাগেনি। এমন পাগল হয়ে ওঠেনি ও এ জীবনে কারো জন্যেই।

শুক্লা বললেন, কী হলো ? কী ভাবছেন অত ? নিধুবাবুর গানের কি হলো ?

চাঁদু যেন সম্বিত ফিরে পেলো। বললো, তার আগে কল্যাণদাকে আপনার নামটা লিখে নিতে বলি। মাসিমণি আপনার কথা বিশেষ করে লিখেছিলেন ভালো গাইয়ে হিসেবে।

শুক্লা উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বললো আপনার মাসিমণির কথা ছাড়ুন। বিয়ের আগে ক্লাসিক্যাল শিখতাম। কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তা তো দেখছেনই। তিনি তো 'GUN' ভালোবাসেন, গান ভালোবাসেন না।

চাঁদু বললো, ভগাদা নাই বা ভালোবাসলেন। আমি, মানে আমরা সকলে তো ভালোবাসি। বিন্দিয়াও তো ক্লাসিক্যালই গায়। একটা ঠুংরী গাইবেন, কদর-পিয়া ; অথবা ভজন। দাঁড়ান। আমি কল্যাণদাকে ডাকি।

কল্যাণবাবু কাছেই ছিলেন। ডাকতে হলো না, ওঁর নাম শুনেই এগিয়ে এলেন। বললেন কী ব্যাপার ?

এই যে। আরেকজন ট্যালেন্ট। শুক্লা রায়। ইনিও গাইবেন।

এই লিখলাম নাম। আমাদের এবারে খুব সৌভাগ্য। সব প্রোগ্রামটাই আমরা ক্যাসেট করে রাখব। এলাহাবাদ থেকে লোক আনছি ভিডিও ক্যামেরা ভাড়া করে। কারণ শিগগিরি টিভি এসে যাবে এখানে। তখন আপনাদের মুখগুলি আর সুরগুলি বরাবরের মতো থাকবে আমাদের সঙ্গে।

তবে তো আরো গাইবো না। লোকে একবার শুনে ভুলে গেলেও না হয় হতো।

কল্যাণদা বললেন, জানেন তো, আমার মায়ের অটোগ্রাফের খাতাতে শরৎবাবু লিখে দিয়েছিলেন, যে, "লজ্জা নারীর ভূষণ। কিন্তু গানের বেলা নয়।"

কোন্ শরৎবাবু ? দাদাঠাকুর ?

না, না, শরৎ চাটুজ্যে। সাহিত্যিক। অতএব আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না।

কল্যাণদা নাম লিখে নিয়ে চলে গেলেন।

দেখলেন তো। কী বিপদেই ফেললেন আপনি আমাকে।

ভগাদা বললেন, কেন পাঁচখানি গান তো তুমি জব্বর ভালো গাও। বিয়ের আগে আমার মাকে মন্ত্রমুগ্ধ করার জন্যে যে পাঁচখানি শিখেছিলে। তার যে-কোনো একখানি গাইলেই লোকে নেবে। ছ'খানি কেউ গাইতে বললেই মুশকিল। পাঁচটি অবধি তো তোমাব ভয় পাবার কথা নয়। দ্রৌপদীর মতোই অবস্থা তোমার। তার ছ' নম্বর স্বামী থাকলে দ্রৌপদীর যে কী অবস্থা হতো তা আমাদের কারোই জানা নেই। পাঁচ নম্বর, হিসেবে হচ্ছে সেফেস্ট। এদিকে দুই, ওদিকে দুই, মধ্যিখানে এক। পগার জার্নাল যেমন প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে বেরোয়। লাকি নাম্বারও বটে। বাপের কষ্টার্জিত টাকা থাকলে মানুষ কত ভাবেই না তা নষ্ট করতে পারে। এর চেয়ে অন্নপূর্ণা পুজো করে কাঙালীদের খিচুড়ি খাওয়ালে ঢের বেশি পুণ্যি হতো।

বলেই বললেন, আরে চেঁদো, পগা কিন্তু তোব উপরে বেজায় চটে রয়েছে। তুই পগাকে কিছু বলতে বললিনি ? পগাব মধ্যিটা জ্ঞানে গম গম কবছে। বাখ, বাটোভেন, মোৎজার্ট, শেক্সপীয়র, আন্তোনিয়নি এবং ফেলিনির ছবির পার্থক্য কি এবং কোথায় ? উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গানের সঙ্গে আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গানের ক্রিটিকাল তুলনা অথবা পাণ্ডা ভাল্লুক কিংবা গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ রেয়ার স্পেসিসকে বাঁচাবার জন্যে বেশি জোর দেওয়া দরকার এই সবেব যে-কোনো একটি বিষয়ে পগাকে বলতে বল ? পরিচয় করিয়ে দে সেদিন, সকলকে বল যে, রানীওড়ার রাজার বাবার সৌভাগ্য যে এমন একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ লোক তাদের মাঝে উপস্থিত আছেন।

পগাদা কিন্তু চটলেন না। মনে হলো ওঁর সত্যিই কিছু বলার ইচ্ছে আছে। এরকম গুণী-জ্ঞানী ও যে দেখেনি তা নয়। তাঁদের মধ্যে ফুটন্ত কেটলির জলেরই মতো জ্ঞান টগবগ করে। মাঝে মাঝে কেটলি থেকে বাষ্প বের না করে দিলে, সন্ন্যাসী বা নানেদের কামের মতো, তা আধার বিদীর্ণ করার আশঙ্কা ঘটায়।

হেমমাসি বললেন, ভগা, আজ পুজোর দিনে তোর কি পগার পেছনে না লাগলেই নয়।

এই তো আমার পুজো মা। যার যেমন পুজো।

কি হচ্ছে ? চিত্রা বললো।

ইউ ট্যু ব্রুটাস ?

চাঁদু পগাদাকে শুধোলো, বললো, কল্যাণদাকে ডাকি পগাদা ?

নো। নেভার। আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না।

এখানে কিন্তু অনেক······

আমি সাইজ-আপ করে নিয়েছি। আই ডোণ্ট কনসিডার দ্যা অ্যাসেমব্লি অ্যাজ অফ দ্যা ডেজায়ার্ড লেভেল অফ এনলাইটেন্‌মেণ্ট।

বলেই, ভগাদার দিকে ফিরে বললেন. ভগা, আই টোল্ড ড্যু মেনি টাইমস দ্যাট ড্যু শুড নট ইনডাল্‌জ ইন মোর ইনডিগনিশান টুওয়ার্ডস মী দ্যান ড্যু ক্যান কনটেইন।

ভগাদা পাইপটাকে ডান পায়ের ওপর তোলা বাঁ পায়ের বিদ্যাসাগরী চটির হিলের উপর দুবার ঠুকে হেসে বললেন, উইনস্টন চার্চিলকে মারলি তো। তুই কি জীবনে নিজস্ব একটি সেনটেন্সও বলতে পারবি না ? এই কি তোর পড়াশুনোর নমুনা পগা ? বাবা মারা গেছিলেন সেরিব্রাল অ্যাটাকে, মরে গিয়েও বেঁচে থাকলে এবারে মারা যেতেন করোনারি অ্যাটাকে। মরে বেঁচে গেছেন ভদ্রলোক। বাবার দুবার মরা কোনো শালা, সরী ; ঠেকাতে পারতো না। রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন তোর মনে পড়ে না ? 'সহজ হবি, সহজ হবি'। যার কচ্ছপের মাংস হজম হয় না তার তা খাওয়া উচিত নয়। কচ্ছপের মাংসেরই মতো পড়াশুনো তুই হজম করতে পারিস না, আস্ত আস্ত টুকরো উগরে দিস। তবে পড়াশুনো করা কেন ? যার জন্যে যা নয়।

কল্যাণদা দৌড়ে এসে বললেন ভোগ হয়ে গেছে মাসিমা। চলুন, আপনারা আগে বসে পড়বেন। দূরের যাত্রী। জায়গাও হয়ে গেছে। খিচুড়ি, লাব্‌ড়া, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা আর টোম্যাটোর চাটনি।

বাঃ। খাসা মেনু। ভগাদা বললেন।

চলো বাবা চাঁদু।

আমি পরে। সবার খাওয়া হলে কল্যাণদাদের সঙ্গে খাবো মাসিমা। আপনারা খেয়ে দেয়ে এগোন। বিশ্রাম করে বিকেল বিকেল আসবেন তো আরতি দেখতে ?

নিশ্চয়ই আসব। ওরা আসুক আর নাই-ই আসুক।

চাঁদু বললো, আমি যাই। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আসি। ও-ও আপনাদের সঙ্গে বসে খেয়ে নিক।

পগাদা ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বললেন, হাউ ডেয়ার ড্যু ইনসাল্ট আস ?

চাঁদু বুঝতে না পেরে বললো আঁজ্ঞে ?

ভগাদা এগিয়ে এসে বললেন, কিছু না। তুই মায়েদের নিয়ে যা চাঁদু। আমি ইমরানকে ডেকে আনছি।

চাঁদু ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো। ভগাদা যখন ট্যাক্সিড্রাইভার ইমরানকে নিয়ে এলেন তখন আর মাত্র দুটি জায়গাই খালি ছিলো। ইমরানকে নিয়ে ভগাদা পাশাপাশি বসলেন। পগাদাদের থেকে অনেক দূরে। বললেন, খিচুড়ি খাতা তো ?

জী সাব। বহত পেয়ারসে খাতা।

তব্ তো মজা আ যায়ে গা আজ।

বলেই, পগাদাকে দেখিয়ে ইমরানের কাঁধে একটা হাত তুলে দিয়ে বললেন, শরমানা মৎ। আচ্ছাসে খানা।

বলেই, চাঁদুকে বললেন, তোর কর্তব্য করছি চাঁদু।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁরা সকলেই চলে গেলেন। এখানে বেশির ভাগ লোকই বসে খান না। বাড়ি বাড়ি ভোগ পৌঁছে দিয়ে আসা হয়। পুজোর দিন, ভালোমন্দ রান্না হয়। তার সঙ্গে সকলেই একটু করে ভোগ খান।

ভগাদা চাঁদুকে বললেন, তোর বাইক নিয়ে এসেছিস ?

হ্যাঁ।

দে তো চাবিটা। তুই অন্য কারো ট্রান্সপোর্টে তোর কোয়ার্টারে চলে যাস। গিয়ে রেস্ট করিস। আমি মীর্জাপুর শহরটা একটু সার্ভে করে আসি। বাড়ি ফিরলেই তো পগার সঙ্গে লাগবে।

শুক্লা, ভগাদাকে একটু পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি আসবে না আমাদের সঙ্গে ?

না গো। দুপুরে সহবাস করে ছোট্ট-ছোট্ট স্টেশনের স্টেশনমাস্টারেরা। রাতের মেল গাড়িকে সবুজ বাতি দেখাতে হয় বলে। রাতে পুষিয়ে দেবো। এখন যাও লক্ষ্মীটি।

চাঁদু শুনতে পেলো, ভগাদা বললেন।

এত্তো অসভ্য না।

বলেই, চাঁদু কথাটা শুনেছে বুঝতে পেরে মুখটা বেচারীর লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। মাথা নিচু করে ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেলেন শুক্লা। চাঁদু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো শুক্লাকে। আর ইমরানকে দশটা টাকা দিয়ে বললো, নানকু পানওয়ালার দোকান থেকে ভালো পান খাওয়াবে মাজীকে আর বহুজীদের।

চিত্রা আর হেমমাসি পান খান। স্নিগ্ধা আর শুক্লা খায় না।

আচ্ছা বাবা, রাতে দেখা হবে।

হেমমাসি বললেন।

চিত্রা আর শুক্লা হাত তুললেন। বললেন, টা-টা।

স্নিগ্ধা শুধু তাকালো একবার। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে। মনে হলো কী যেন বলবে বলবে করেও বললো না চাঁদুকে।

লাল ভিজে কাঁকর আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে এবং উড়িয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেলো। চাঁদু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। স্নিগ্ধা কিন্তু একবারও পেছন ফিরে চাইলো না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চাঁদু মণ্ডপের দিকে এগোলো। একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন উপরে শরতের ঝকঝকে নীলাকাশ। পুজো মণ্ডপের মাইকে হেমন্ত মুখার্জীর গান বাজছিলো। "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে·····

তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখিকোণে—
আমি বসে বসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি,
তুমি আছ দূর ভুবনে ॥
বারেক তোমারে শুধাবারে চাই বিদায়কালে কী বল নাই,
সে কি রয়ে গেলো গো সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে।"

হেমন্ত মুখার্জীর গলার এই গানখানি তাঁর নিজের গলায় এবং রেকর্ডে অজস্রবার শুনেছে এর আগে। ভালো লেগেছে। কিন্তু এমন করে বিদ্ধ করেনি তাকে।

আলো-জ্বলা প্যাণ্ডেলের পাতলা হয়ে-আসা ভিড়ের দিকে এগোতে এগোতে চাঁদু ভাবছিলো কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাৎপর্যই একবার শুনলে বা বহুবার শুনলেও প্রাঞ্জল হয় না। কখন, কোন মুহূর্তে যে বহুশ্রুত কোনো গান এমন করে বুকের মর্মমূলে এসে বেঁধে তা আগে থাকতে কোনো শ্রোতা বোধহয় বলতে পারেন না। ক্লাসিক সাহিত্যও যেমন বার বার পড়লে প্রতিবারই তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, ভালো গায়ক-গায়িকার গলায় গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতও বোধহয় সেই কারণেই অজস্রবার শুনেও পুরোনো তো হয়ই না হঠাৎ কোন্ মুহূর্তে তা মরকতমণির দেবদুর্লভ ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে উঠে মনের চোখকে ঝল্‌সে দেবে তা পূর্বমুহূর্তেও বলা যায় না।

॥ পাঁচ ॥

ভগাদা চাঁদুদের খাওয়ার পরে একটা চেয়ারে বসে অন্য চেয়ারে পা তুলে

দিয়ে সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেন আর পাইপ ফুঁকলেন। চেয়ারে পা তোলার আগে সকলের কাছ থেকেই অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন।

ভগাদা মানুষটির মধ্যে এমন কোনো সম্মোহনী শক্তি আছে যা তার চারপাশে যারাই থাকে তাদেরই আকৃষ্ট করে রাখে। এবং মনে হয়, হয়তো সেই কারণেই তাঁর নিজের বড় ভাই পগাদারই মতো ভগাদাকে ঈর্ষা করার মানুষের অভাব নেই। ভগাদার মতো মানুষদের দশজনের কাঁধে চড়ে নেতা বা দলপতি হতে হয় না, হতে হয় না ক্রুর ইতর চক্রান্তেব মাধ্যমে অথবা নিজেরা অদৃশ্যে থেকে মেঘনাদ-বধ বাণে যে প্রতিপক্ষকে সম্মুখ সমরে হারানোর কোনোই সম্ভাবনা নেই সেই প্রতিপক্ষকে ভূতলশায়ী করে। তেমন করে যে-সব মানুষ বড় হতে চায় বা বড় হয় তাদের বড়ত্বের মাপ বডই ছোটো। শুধু তাই-ই নয়, তা তাঁদেব নিজেদের আত্মসম্মানজ্ঞান থাকলে তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের নিজেদের পক্ষেও তা কতখানি অপমানজনক। এই রানীওয়াড়া টাউনশিপের ছোট অফিসে, এখানকার সমাজে, ক্লাবেও, এরকম প্রতিনিয়ত বড হওয়াব চেষ্টা করা মানুষদেব ভিড় কম নয়। অন্যের কাঁধে চড়ে বড হওযার চেষ্টা এবং যাঁরা এই সব মেকি বড়দের কাঁধে করে বেড়ান অনুক্ষণ গুণহীন সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাইকোফ্যান্টসদের দেখে দেখে চাঁদু ক্লান্ত হয়ে গেছে।

এবারে পুজোর সময় ভগাদা আর স্নিগ্ধার সঙ্গে আলাপিত হওযাটা বিশেষ দুটি ঘটনা হয়ে থাকবে ওর জীবনে। এই ঢেউয়ের স্রোত তাকে কতদূবে, কোন্‌দিকে নিয়ে যাবে জানে না চাঁদু। তবে স্রোতে ভাসার মধ্যেও যে একটা আলাদা উত্তেজনা, উন্মাদনা আছে এ কথা এর আগে ও কখনওই জানেনি। জীবনটা যখন বেশ একঘেয়ে, গন্তব্যহীন, রানীওয়াড়ার টাউনশিপ-এর অন্য অনেক মানুষেরই মতো দৈনন্দিনতার দৈন্যতে ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো ঠিক তখনই ওঁরা সকলে এসে ওর জীবনে এক বিশেষ ঘটনা অথবা ঘটনার সূত্রপাত করলেন, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

ভগাদা বললেন, চল দেরিই যখন হলো তোকে নামিয়েই দিয়ে যাই। কোয়ার্টারটাও চেনা হয়ে যাবে। তারপর মীর্জাপুর থেকে ফিরে তোর ওখানেই চান সেরে নিয়ে এখানে চলে আসব। গীজার আছে তো রে? বাথরুমে?

চাঁদু বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে।

বাড়িতে তুই না-থাকলে তোর লোককে বলে রাখিস আমার কথা। নতুন তোয়ালে বের করে রাখতে বলিস। তোর যে ভিডি কিংবা এইডস নেই তা আমি

জানবো কি করে ? চাঁদমুখের ছেলে বলেই ভয় আমার বেশি। একটু চা-এর কথাও বলে রাখিস।

ঠিক আছে। তুমি চলো না। সব বন্দোবস্তই থাকবে আমি যদি নাও থাকি।

বললো, চাঁদু।

মণ্ডপের সকলেই বিকেলে ভগাদাকে আবার আসতে বললেন আন্তরিকভাবেই।

মোটর সাইকেলে উঠে উনি বললেন কোন দিকে যাব বল।

সোজা গিয়ে ফারস্ট টার্ন রাইট, তারপর সেকেণ্ড টার্ন লেফট।

স্টার্ট করলেন মোটর সাইকেল। নিজের মনেই বললেন বেড়ে টাউনশিপটা কিন্তু। প্রতিটি পথ-ঘাট এতো ওয়েল-প্ল্যানড। দোকান, বাজার, হাসপাতাল, কম্যুনিটি হল। প্রত্যেক পথের দু পাশে বড় বড় গাছ। ভারী চমৎকার লাগে। বড় গাছেব নিচে এলে দারুণ একটা ফীলিং হয়, না রে ?

হ্যাঁ।

কেমন বল তো ?

ভালো লাগে।

দুসস, ইডিয়ট। এটা একটা এক্সপ্রেশন হলো ? কেমন ভালো লাগে তা বলবি তো ?

মায়ের কাছে বসলে যেমন মনে হয়।

তাই ?

বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন ভগাদা। তারপরই বললেন, বড় গাছের নিচে এলে আমার মনে হয় বৌ-রে কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি।

হাসি থামিয়ে, স্পীড কমিয়ে, ডানদিকে মোড় নিতে নিতে বললেন ব্যাপারটা অবশ্য একই। পুরুষ মানুষ যখন যে নারীর কোলে মাথা রাখে সে তখন হচ্ছে তার। শৈশবে আর কৈশোরে সে মায়ের, যৌবনে স্ত্রীর আর পৌঢ়ত্বে....।

প্রৌঢ়ত্বে কি ?

প্রৌঢ়ত্বে রাঁড়ের।

ছিঃ ছিঃ।

চাঁদু বললো।

তারপর বললো, আপনি জোর করে করে সবসময় এরকম খারাপ কথা বলেন কেন বলুন তো ? রক্ষিতও বলতে পারতেন অথবা নদীয়া জেলার লোকেরা যেমন বলে : রাখন্তি।

দূর দূর। ষাঁড়, রাঁড় এসব কথার মধ্যে কেমন একটা গুঁতোগুঁতির গন্ধ আছে লক্ষ করিসনি? তা না রাখন্তি! মরে যাই!

বাঁয়ে টার্ন নিয়ে চাঁদুকে নামিয়ে দিয়ে বাইক ঘুরিয়ে নিলেন ভগাদা।

বললেন, বেড়ে কোয়ার্টার তো রে তোর। বাঃ সামনেই তো জঙ্গল-পাহাড়। এখান দিয়ে শিবাজীরাও-এর কাছে শর্টকার্ট-এ যাওয়া যায় না? পাহাড়টা তো একই? না কি? এটাই তো ঘুরে গেছে।

তা বটে। কিন্তু কখনও চেষ্টা করিনি।

আমি করব। অবশ্য পায়ে হেঁটে। এই গভীর শালজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তোর এই বাইক তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে না।

আপনি গেলে, আমিও যাব। নট আ ব্যাড আইডিয়া। একাদশীর পরে।

কেন? একাদশীর দিনে তুই পুরোনো দিনের বিধবাদের মতো উপোস করিস না কি?

আঃ। সেদিন ফাংশান না?

ও হ্যাঁ। ওক্কে। আমি চললাম তাহলে। তোর কোয়ার্টারের নাম্বার কতো?

এই রাস্তায় কী বড় রাস্তায় যাকে হয় নাম জিগেস করবেন আমার। তাহলেই হবে।

কেন জিগেস করতে যাবো? কে আমার ধর্মেন্দ্র এলেন রে আমার তাছাড়া এই সব হচ্ছে টীপিক্যাল ইণ্ডিয়ান পরনির্ভরতা। পশ্চিমের কোনো দেশেই পথে পথে বেকার লোক ঘুরে বেড়ায় না যে তোকে ভলান্টিয়ার সার্ভিস দেবে। অমন আশা করারই বা দরকার কী? কোয়ার্টারের নাম্বারটা বল।

বি-প্লাস ফোর। দ্যা সেকেণ্ড ব্লাইণ্ড লেন। লেখাই তো আছে গেটে।

সরী। তাই তো। লেখাই তো আছে। ওক্কে। সী উ্য। বলেই, মোটর সাইকেল ভটভটিয়ে ভগাদা চলে গেলেন।

বাইকের আওয়াজ শুনেই সুরজ দরজা খুলে দিলো। বলল, ম্যায় জারা বাহার যাউঙ্গা সাব।

যাও। মগর ছে বাজনেকি পহিলেহি আ যানা। চায়ে পীকর ম্যায় ফিন যাউঙ্গা।

সুরজ তার হাতের এইচ-এমটি ঘড়ির দিকে দেখলো। চাঁদুও বসার ঘরের দেওয়াল ঘড়ি দেখল। সাড়ে-তিনটে বাজে এখন। সুরজ বলল, জী সাব।

সুরজ চলে গেলে দরজা বন্ধ করে ও ঐ জামাকাপড় পরেই এসে বিছানাতে শুলো। ক্লান্ত লাগছে। আজ পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে। কাল মহাষ্টমীর দিন

ধুতি পাঞ্জাবি পরবে। আবারও পরবে বিজয়া দশমীর দিন। ঐ দুদিন গাড়ি চাইতে হবে। ধুতি পরে মোটর সাইকেল চালানোর বিস্তর অসুবিধে। ভগাদা বিচিত্রবীর্য মানুষ। সবাই সব পারে না। ধুতি আর তালতলার বিদ্যাসাগরী চটি পরে মোটর সাইকেল চালানোর কথা চাঁদু ভাবতেও পারে না।

বিছানাতে শুতেই স্নিগ্ধার মুখটি মনে পড়লো। ভেবেছিলো, খাটে পড়বে আর মড়ার মতো ঘুমুবে। আজ খুব ভোরে উঠেই মণ্ডপে গেছিলো। কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলো না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। শালজঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে দ্রুত বেগে উড়ে গেল। এখন হরিয়ালদেরও দেখা যায়। ব্যানার্জি সাহেবের কোয়ার্টারের সামনে অশ্বত্থ গাছের ফল পেকেছে। হরিয়ালের ঝাঁক তার মধ্যে বসে ফল খায় শরতের রোদে পাতা ঝিলমিল করে। গাঢ় সবুজ পাতার মধ্যে মধ্যে পাতা-রঙা হরিয়ালেরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে বোঝাই যায় না। যখন গাছ ছেড়ে ওড়ে তখনই বোঝা যায় তাদের অগণ্য সংখ্যা।

বিছানাতে এপাশ ওপাশ করতে করতে রোদ পড়ে এলো। এখনও কম্বল গায়ে দেবার মতো ঠাণ্ডা লাগছে না কিন্তু ঠাণ্ডায় গা-শিরশিরও করছে। ছায়াছন্ন শালবনে গভীর থেকে যখন তিতিররা চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে ডাকাডাকি শুরু করলো ঠিক তখনই ওর চোখ বুজে এলো।

ঘুম যখন গভীর হয়েছে ঠিক তখনই কলিং-বেল বাজলো। বিরক্ত হয়ে, ঘুম-চোখে উঠে এসে বসার ঘরের ঘড়ি দেখলো। ওর হাতঘড়িটা অয়েলিং করতে দিয়েছে। ঘড়িতে সাড়ে চারটে। দরজা খুলতে খুলতেই একটি অ্যামবাসাডর গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ পেলো। গাড়িটা ব্যানার্জী সাহেবের বাড়ির দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো, যে চালাচ্ছিলো সে। গাড়িটা এসে ওর কোয়ার্টারের গেটেই দাঁড়ালো।

দরজা খুলতেই দেখলো স্নিগ্ধা। লাল আর হলুদ স্ট্রাইপের একটি মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি পড়েছে। হলুদ ব্লাউজ। ওর ঘর হলুদ আর নরম লালে আলো করে স্নিগ্ধা ঢুকলো। পারফ্যুমের গন্ধে ঘর ভরে গেলো। স্নিগ্ধা একা।

স্নিগ্ধা ইমরানকে বললো, আপ চলা যাইয়ে ওয়াপস্। উনলোঁগোকো প্যাণ্ডেলমে ছোড়কর হিয়াই আ যানা।

বসুন। বসুন।

চাঁদু বললো। হঠাৎ এতো বছর পরে চাঁদুর বসার ঘরটা ওর কাছে বড় নিরাভরণ, বড় হতশ্রী, বড় ছোট্ট বলে মনে হলো। স্নিগ্ধাকে বসতে দেওয়ার

মতো আসন খুঁজে পেলো না যেন ঐ ঘরে।

হয়তো ওর মনেও।

স্নিগ্ধা অতগুলি সোফার একটিতেও না বসে ওর লেখা-পড়ার, চিঠি-লেখার রাইটিং-ব্যুরোর সামনের সোজা-পিঠ কাঠের চেয়ারখানি টেনে নিলো। চেয়ারটি ঘুরিয়ে চাঁদুর দিকে মুখ করে বসলো। হাতের ভাঁজ করা হলুদ রঙা মলিদাটি চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে দিলো। তারপর পায়ের উপর পা তুলে বসে চেয়ারের দুই হাতলে দু কনুই রেখে দু হাতের দু পাতার মাঝে নিজের মুখটিকে ফুটিয়ে তুলে বললো, ওরা সবাই ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। আপনার কথা মনে হলো। ভাবলাম, আপনার নিজস্ব পরিবেশে আপনাকে দেখে যাই। জানোয়ারদের যেমন গুহা, শুকনো পাহাড়ী নদীর খোল, মানুষের তেমন বাসস্থান, বাড়ি। আপনাকে দেখতে এলাম। মানে, আপনার বাড়িতে আপনাকে।

তারপরই নিজের মনে বললো, কী সুন্দর। জানালা দিয়ে সামনের শালজঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে বললো স্নিগ্ধা।

চাঁদু কী করবে বুঝতে না পেরে ধুপ করে ইজিচেয়ারে বসে পড়ে, কী বলবে ভেবে না পেয়ে বললো, চা খাবেন ? ওমলেট ? আমি খুব ভালো ওমলেট বানাতে পারি।

হয়তো পারেন। তবে ওমলেট বানানো ছাড়াও অন্য অনেক গুণ আপনার আছে যে, তা লক্ষ করেছি।

চা ?

না। থ্যাঙ্ক উ্য। চা এখুনি খেয়ে এলাম।

তারপর বললো, দুপুরবেলা ঘুমোন কেন ?

ঘুমই না। আজ খুব সকালে উঠেছিলাম। প্যাণ্ডেলে এতো লোকের সঙ্গে এতো কথা বলতে হলো বলে খুবই ক্লান্ত লাগছিলো।

অত কথা বলার দরকার কি ?

দরকার নেই। তবে, বিশেষ বিশেষ দিন, বিশেষ বিশেষ লোক।

বলেই, কথা ঘুরিয়ে বললো, পুজো তো বছরে একবারই আসে। তাছাড়া সব বার তো থাকিও না এখানে। কলকাতা চলে যাই।

এবারে গেলেন না, কি আমরা আসবো বলেই ?

সেটাও একটা কারণ। তাছাড়া গত বছর পুজোর পরই মা চলে গেলেন। কালীপূজার রাতে। শেষ পিছুটান ছিন্ন হলো। কলকাতার সঙ্গে সব বন্ধনই প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছে। বন্ধুবান্ধবেরাও বেশিই বাইরে চলে গেছে। কেউ কেউ

দেশেরই অন্য শহরে। কেউ কেউ বিদেশে। তিরিশ টিরিশ যাদের বয়স, তাদের একাকিত্বটা, বিশেষত ভাইবোনও না থাকলে বড়ই ভারী বলে মনে হয়। জানি না, কিছুদিন পরে হয়তো এমন লাগবে না।

লাগবে না। স্নিগ্ধা বললো। আসলে আমরা সবাই-ই একা। একা আসা, একা ভাসা, একা চলে যাওয়া। এই বিচ্ছিরি সত্যি কথাটা বুঝতে সময় লাগে অনেক। অবশ্য যতদিন না-বুঝে থাকা যায় ততদিনই ভালো।

আপনি কলকাতাতে কি করেন ?

আমাকে আপনি নাও বলতে পারেন। তুমিই বলবেন।

তুমি ?

হ্যাঁ। আপত্তি ?

না। আসলে না, মেয়েদের তুমি বললেই একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাব মনে মনে।

হেসে উঠলো স্নিগ্ধা। তার হাসির স্নিগ্ধতা চাঁদুর মন ভরে দিলো।

ও বলল, মজার কথাই বলেছেন। যাক। তাহলে "তুমি" নাই-ই বললেন। প্রেমকে আপনার খুব ভয় মনে হচ্ছে। কখনও কি প্রেমে পড়েছিলেন আগে ?

প্রেমে ?

বোকার মতো বললো চাঁদু।

তারপরই বললো, না। এর আগে পড়িনি কারো সঙ্গেই।

এর আগে মানে ?

স্নিগ্ধা তার দুটি চোখ চাঁদুর দুটি চোখের উপর পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরলো যেন চাঁদুর চোখের একটুও বাকি না থাকে এমনি করে। একেবারে টায়ে-টায়ে।

মানে....।

চাঁদু মুখ নামিয়ে নিলো। ও যে এমন ক্যাবলা হয়ে যেতে পারে কারো সামনে, এমন অপ্রতিভ তা সদা-সপ্রতিভ চাঁদু হৃদয়ঙ্গম করে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

স্নিগ্ধা বললো, উ্য আর ভেরী ভেরী হ্যাণ্ডসাম ইনডিড। কিন্তু ব্রাশ করলে আপনাকে আরও হ্যাণ্ডসাম দেখায়। আপনি সত্যিই পিওর, আন-পল্যুটেড। এমন তিরিশ বছরের পুরুষ আজকাল দেখা যায় না। মেয়েদের সম্বন্ধে সেই যে কোন্ কবি বলেছিলেন না ? "Sweet Seventeen Yet unkissed।" আপনাকে দেখে আমার তাই-ই বলতে ইচ্ছে করছে।

চাঁদু আরও লজ্জা পেয়ে কিছুক্ষণ মুখ নামিয়ে রইলো। স্নিগ্ধার চোখের দিকে বেশিক্ষণ চাইতে পারে না ও। সেই মোগলসরাই স্টেশান থেকেই লক্ষ করছে।

হঠাৎ ওর হারিয়ে যাওয়া সপ্রতিভতাকে খুঁজে পেয়ে চাঁদু বললো, আমারও একজন ইংরেজ কবি আর বাঙালী কবির কবিতার কথা মনে হয়েছিলো স্টেশানে তোমাকে প্রথমবার দেখেই।

"তোমাকে" বলে ফেললেন কিন্তু। এর পরে যদি প্রেম হয়ে যায় তবে আমাকে দোষ দেবেন না যেন। এখন বলুন কোন্ কোন্ কবির কথা মনে পড়েছিলো।

প্রথমেই মনে পড়েছিলো জীবনানন্দ দাশ-এর কথা।

কোন্ কবিতা?

বনলতা সেন।

উঁহু! খুশি হলাম না মোটেই। বনলতা সেনের সঙ্গে বাঙালী প্রেমিকের তুলনাটা সূর্যাস্তের ফোটোগ্রাফেরই মতো এখন 'ক্লিশে' হয়ে গেছে। এবার ইংরিজি কবির কথা বলুন।

চাঁদু বললো, কবির নাম এতদিন পরে আজ আর ঠিক মনে নেই। সম্ভবত লেসলি এবারকম্বি। ঠিক নাও হতে পারে।

কবিতাটি?

হ্যাঁ।

"She! She!
like a visiting sea
Which no door
Could ever restrain"

বাঃ! ওয়াণ্ডারফুল! আমি না হয়ে অন্য যে-কোনো মেয়ে হলে এই একটি কবিতাতেই মরে যেত। কিন্তু লাইক আ ক্যাট, আই হ্যাভ নাইন লাইভস। ফরচ্যুনেটলি।

বলেই, বললো, ছোড়দা কোথায়? ঘুমাচ্ছে?

ছোড়দা? মানে ভগাদা? অবাক এবং অপরাধীর গলায় চাঁদু বললো, উনি তো আমাকে নামিয়ে দিয়ে মীর্জাপুরে চলে গেলেন। বললেন, শহরটাকে একটু সার্ভে করে আসি। আমি যে একা বাড়িতে আছি তা আপনি জানতেন না? সরী।

স্নিগ্ধা খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো, কেন? একা বাড়ির আপনার কাছে আসা কি ভয়ের? আপনি তো আর আমাকে রেপ করছেন না?

চাঁদু বোকার মতো মুখ নামিয়ে রইলো। এই পরিবারের প্রত্যেক ছেলেমেয়েই

একটু অস্বাভাবিক। হয় জিনিয়াস নয় পাগল। ভাবলো চাঁদু।

স্নিগ্ধা চিন্তান্বিত গলায় বললো, এই রে। মীর্জাপুরে কোনো খারাপ পাড়া টাড়া আছে? মানে রেড-লাইট এরিয়া?

জানি না। তবে শুনেছি একটি বাইজী-মহল্লা আছে। মীর্জাপুর একসময় গালচে, গোলাপফুল, গুণ্ডা আর বাইজীদের জন্যে বিখ্যাত ছিলো।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে নিশ্চয়ই কোনো বাইজীর কাছেই গেছে। আতরের দোকান আছে কি?

থাকবে নিশ্চয়ই। যেখানেই মুসলমান আছে সেখানেই একটি চাঁদনী চওক থাকবেই। এবং চাঁদনী চওক থাকলেই আতরের দোকান, কাবাব-পরোটার দোকান, পানের দোকান এবং আতরের দোকানও থাকবেই।

তবে আর দেখতে হবে না।

চাঁদুকে ভয়ার্ত দেখালো। বললো, ভগাদা যাবেন না কি? কি হবে?

স্নিগ্ধা আবারও হেসে উঠলো। বললো, আপনি না। সত্যি। গেলেই বা। বাইজীরা তো বাঘ নয়। মেয়েই। তারাও গান গায় আমিও গান গাই। তফাত হচ্ছে এইটুকুই যে ওরা পুরুষদের আনন্দ দিতে জানে। আমরা হয়তো জানি না। ওদের রং-চঙ, নাচ-গানের রকমটাই আলাদা। আমার মনে হয় ছোড়দা বোধহয় গত জন্মে কোনো মুসলমান নবাব ছিলো। এবং ওর হারেম-টারেমও ছিলো। অমন এনার্জিটিক পুরুষের তা থাকতেই পারে। আমাদের দেশের ভদ্রঘরের মেয়েদের বৌদের অপূর্ণতা, অপারগতা, ন্যাকামি, বিয়ে হয়েছে বলেই স্বামীকে চিরদিনের জন্যে পেয়ে গেছে এই ভুল ধারণা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণই সচেতন। তবে এ কথাও বলব যে, ছোড়দার শরীরে কোনো কলঙ্ক লাগলেও লাগতে পারে, মনে কোনোদিনও লাগবে না। ও হচ্ছে আমার কাছে কনসেপ্ট অফ পৌরুষ।

যদিও আমি মাত্র তিনদিন হলো দেখছি। আমিও ভগাদার প্রেমে পড়ে গেছি। এমন ভার্সেটাইল, হিউমারাস, টোটালি আনপ্রেডিকটেবল পুরুষ আমিও কখনও দেখিনি।

সর্বনাশ করেছে। আমার সেকেণ্ড লাইফও গান। হারাধনের দশটি ছেলের মতো বেড়ালের নটি জীবনের সাতটি রইলো বাকি।

এমন সময় কলিং-বেল বাজলো। চাঁদু উঠে গিয়ে দরজা খুললো।

ডাক-পিওন। চিঠি। একটি এলাহাবাদ থেকে। হাতের লেখা দেখেই চিনলো, ভরত যাদবের। অন্যটি শ্যামলদার। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লেখা। ওটা পরে

পড়বে। খুব বড় চিঠি লেখেন শ্যামলদা। অনিয়ন-স্কিন পেপারে। ভরত মাঝে মাঝেই চাঁদুর প্রযত্নে বিন্দিয়াকে চিঠি লেখে। বিন্দিয়াও চাঁদুর মাধ্যমে চিঠি পাঠায়। এই সব সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ চাঁদু করে কেবল বিন্দিয়ারই মুখ চেয়ে। কিন্তু এই চিঠি লেখালেখিতে ওদের প্রেমেই ঘৃতাহুতি পড়ে। দুজনের ভবিষ্যৎ আরোই বেশি করে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। সবই বোঝে চাঁদু। কিন্তু বুঝেই বা করে কী? ওর তো করণীয় কিছুই নেই।

চিঠি দুটি রাইটিং-ব্যুরোর মধ্যে রেখে দিলো চাঁদু। স্নিগ্ধাকে বললো. একটু মনে করিয়ে দেবেন তো মণ্ডপে যাওয়ার সময় একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে।

কেন? এখানে পড়তে মানা?

না। তা নয়। ও খামের খামটাই শুধু আমার। মধ্যে হয়তো দুলাইনের চিঠি আছে আমার নামে। "ডিয়ার চাঁদু দাদা, হাউ আর হউ? আই অ্যাম সো-সো। উইথ কাইণ্ডেস্ট •রিগার্ডস। ইওরস ভরত।"

ভরতটা কে?

ভরত হচ্ছে বিন্দিয়ার প্রেমিক। ভাবী ভালো ছেলে। দোষের মধ্যে ও জাতে বিন্দিয়াদের চেয়ে ছোট। এই জন্যে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ঝাঁজী বিন্দিয়ার সঙ্গে ভরতের বিয়ে কিছুতেই দিলেন না। ভরত এখানেই কাজ কবত। ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনীয়ার। যেমন দেখতে, তেমন ব্যবহার। কিন্তু হলে কি হবে?

এখন আমার মাধ্যমে দুজনে শুধু চিঠি লেখালেখি করে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে শুধু বিন্দিয়ার বাবাই নন, এখানের সমস্ত উচ্চবর্ণের লোকই আমার উপর বদলা নেবেন। জাত-পাত যে এখানে এখনও কত গভীর শিকড় ছড়িয়ে আছে কলকাতায় বসে তোমাদের পক্ষে ভাবাও মুশকিল। বাঙালীদের অনেকই দোষ থাকতে পারে। কিন্তু এই সব দিক দিয়ে আমরা অনেক উদার।

আমি তা স্বীকার করি না। স্নিগ্ধা বললো। ছেলেবেলায় মা-মাসিমাকে আলোচনা করতে শুনেছি, ও কি বাঙালী? না মোচলমান? বাঙালীর কূপমণ্ডুকতা এমনই ছিলো সেই দিনও যে বাঙালী যে হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই হতে পারে এইটুকু জ্ঞান শিক্ষিত মানুষদেরও ছিলো না।"

তা অবশ্য ঠিক। আমার এক বন্ধু আছে বানারসে। মীর্জা ইসমাইল। খুব ভালো সরোদ বাজায়। অবস্থা অতিই সাধারণ। বাজিয়ে পয়সা নেয় না। নিজের আনন্দেই বাজায়। তাজ হোটেলে চাকরি করে। ওদের বাড়ি যখনই যাই, তখন খানা হয় বিছানার উপর সাদা চাদর বিছিয়ে। তার উপর থাক দিয়ে হাতে-গড়া রুটি সাজানো হয়। এবং মধ্যে মোরগা বা আণ্ডার ঝোলের উঁচু-কানাওয়ালা

দস্তরখান্ বসানো হয়। সবাই একসঙ্গে রুটি তুলে নিই এবং একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে তা থেকে রুটি ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাই মুখে তুলে। তুমি ব্যাপারটির অন্য দিকটা ভাবো। কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাত নেই। ঈদের নামাজে, সে দিল্লির মসজিদেই হোক, ভোপালের মসজিদেই হোক কী কলকাতার রেড রোডে বা ময়দানেই হোক নামাজ যখন পড়েন ওঁরা সকলেই সারে সারে। পাশাপাশি ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত কারো মধ্যে কোনো তফাত করেন না মুসলমানেরা।

তা ঠিক। তবে মেয়েরা যে এখনও অন্ধকারেই আছে। আপনার যে বন্ধুর কথা বললেন তাঁর স্ত্রী বা বোনের সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে ? ওঁরা কেউ কি প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে আপনার মতো ব্যাচেলরের কাছে ফাঁকা বাড়িতে আসতে পারেন ?

স্নিগ্ধা বলল।

না। পরিচয় নেই।

চাঁদু বললো।

এদিক দিয়ে বাঙলার মুসলমানেরা অনেক এগিয়ে এখনও। মেয়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। বাংলাদেশে তো বটেই। অবশ্য এদিকেও আলোকপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত অনেক পরিবার আছেন...

ব্যাপারটা কোনোদিনও উচ্চশিক্ষিত এবং অত্যন্ত নিম্নবিত্তদের মধ্যে ছিলো না। গোলমালটা বোধহয় সামান্য শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্তদের নিয়ে।

তা ঠিক। এ কথা আমি মানি।

স্নিগ্ধা বললো।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে দিলো চাঁদু।

তারপর বললো, অন্যদের এবং আমাব কথা বরং থাক। তোমার কথা বলো।

আমার কথা ? আমার কোনো কথা নেই। এখানে বাঙালী কটি পরিবার আছেন ?

তা সব মিলিয়ে, শ্রমিকদের মধ্যে একজনও নেই; বিভিন্ন ক্যাডারের অফিসার ও কেরানী নিয়ে প্রায় কুড়িটি পরিবার হবে।

ঐ সব পরিবারের বড়দের কথা বলছি না, ছেলেমেয়েদের বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি সঙ্গীতের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ কি আছে ?

একটু চুপ করে থেকে চাঁদু বললো, না। পরের প্রজন্মর বাঙালীরা হয়তো

বাংলাতে শুধু কথাই বলবে, নাও বলতে পারে। বললেও তাও অ্যাফেক্টেড বাংলায়। কিন্তু বাংলা বই পড়বে না, বাংলা গান শুনবে না। বাংলায় চিঠি লিখতে পারবে না। বাঙালিত্ব বলতে তাদের আর কিছুমাত্রই অবশিষ্ট থাকবে না। তাছাড়া বাংলার বাইরে বসে আমরা যতই চাই না কেন বাঙলার বাঙালীদের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই আমাদের জন্যে। বাংলা কাগজ, বই, রেকর্ড, যে কত কষ্ট করে আমাদের পেতে হয় তা আমরাই জানি।

আপনারা এ নিয়ে কিছু ভাবেন না? আপনাব না হয় নিজের ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু যাঁদের আছে? এই ভাবে চোখের সামনে নিজেদেব অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট হতে দিচ্ছেন আপনারা?

চাঁদু হতাশ গলায় বললো, এখানের বাঙালীদের মধ্যে অফিসারই বা ক'জন আছেন? হাতে গুনে বলা যায়। বেশিই কেরানী, স্টোরকীপার, অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের ক্লার্ক। তাঁদের সামর্থ্য কোথায়? হিন্দী এবং ইংরিজি বাধ্যতামূলকভাবে শিখতেই হয়। সংসারের কাজে সাহায্য করতে হয়, তাদের মা-বাবারা সংসাব সামলাতেই হিমসিম। এই অবস্থা শুধু রানীওয়াড়াতেই নয়। বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা দক্ষিণ ভারতের সব জায়গাতেই। আজকাল আসামেও। বরাক উপত্যকা ছাড়া।

একটু চুপ করে থেকে চাঁদু বললো, তুমি যে উদ্বেগের কথা বলছো তা নিয়েই আমরা আরম্ভও করেছিলাম ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানোর জন্যে একটি স্কুল। অনিমেষবাবু, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বাংলায় এম-এ, মাসিক মাত্র একশ টাকা মাইনে নিয়ে পড়াচ্ছিলেনও। সেই টাকাটা আমরা অফিসারেরা ভাগ করে দিতাম। তার মধ্যে আমিই দিতাম পঁচিশ টাকা মাসে। কিছুদিন বাদে অন্যরা তাঁদের সামান্য যা দেয় তাও দেওয়া বন্ধ করলেন। কী করব বলো? অনিমেষবাবুও অভাবী লোক। ঐ সময়টাতে দুটি প্রাইভেট টিউশ্যানি যোগাড় করে নিলেন। বাসস্। স্কুল উঠে গেল।

আপনিই পুরো টাকাটা দিলেন না কেন?

স্নিগ্ধা বললো।

তা দিতে যে পারতাম না এমন নয়। কিন্তু এটা অ্যাটিট্যুডের ব্যাপার। আমার চেয়ে বড় পদের বাঙালী অফিসারও এখানে আছেন। তাঁরাই ঐ সামান্য টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। এসব জিনিসে টাকার চেয়ে অ্যাটিট্যুডটাই বড়। সকলের উৎসাহ-সাহায্য ছাড়া একা করতে গেলে তা নিয়েও সমালোচনা কম হতো না। এই আমাদের বৈশিষ্ট্য। লোকে বলতো বড়লোকি দেখাচ্ছে। এমন ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবার হয়েছে এখানের বাঙালীদের ভালো করতে গিয়ে। এই অবস্থা ভারতবর্ষের বাইরের সমস্ত দেশেও। যেখানেই বাঙালী আছেন।

এক একটি বিদেশী বড় শহরে কতগুলো করে পুজো হয় ? আমাদের মধ্যে একতা, গুণগ্রাহিতা, নিয়মানুবর্তিতা এমনকিঁ ভদ্রতাও তো খুব একটা নেই। স্বীকার না করে উপায় নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, আমার তো মনে হয় বাংলার বাইরের বাঙালীদের, অন্তত দেশের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের এই গুরুতর সংকটের সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, বাংলা বইয়ের প্রত্যেকটি প্রকাশক এবং বাঙালী বিত্তবান ব্যক্তিরা সকলের মিলেমিশে কিছু করা উচিত। অবশ্য শুনেছি আয়কর আইনে বাধা আছে ট্রাস্ট গঠন করে কোনো বিশেষ জাতি বা প্রজাতির হিতার্থে কিছু করলে সেই ট্রাস্টকে "চ্যারিটেবল বা পাবলিক ট্রাস্ট" বলে মানা হয় না। করের আওতার বাইরেও রাখা হয় না। কিন্তু সেই আইন সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। যদি কেন্দ্রীয় সরকার, বা যে-রাজ্যে অন্য রাজ্যবাসীরা আছেন সেই রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গর রাজ্য সরকার এখনও এ নিয়ে কিছু না করেন তাহলে অশেষ ক্ষতি যে পুরো বাঙালী জাতিরই হবে, হচ্ছে প্রতিনিয়ত এই কথাটা কলকাতায় তাদের বোঝাবার মতো কেউই কি নেই। অবশ্য এই ক্ষতি হচ্ছে প্রত্যেক ভারতীয়রই, যিনি জীবিকার কারণে অন্য রাজ্যে বসবাস করছেন। এই সমস্যা সকলেরই। তবে অন্যেরা বাঙালীর মতো আত্মবিস্মৃত নন, এই তফাত। আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর পরে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যার কথা ছেড়েই দিলাম, বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে এমন বাঙালীর সংখ্যাও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে প্রায় থাকবেই না বলতে গেলে। সেটা কি একটি জাতির পক্ষে একটি বিশেষ সংগীত ও সাহিত্য-মনস্ক জাতির পক্ষে, আদৌ শুভ হবে ? কে ভাবে এসব নিয়ে ? কার দরকার পড়েছে ? আমার ছেলে কলকাতা থেকে আসা রেঞ্জারকে বলবে নমস্কার করে "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাঙালীই হচ্ছি।' বাঙালী কোনো কবি সাহিত্যিকের নামও তারা জানবে না, রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবু, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কারো লেখাই পড়তে পারবে না তারা। আমার ছেলেও ঐ রকম বাঙালী হবে এই কথাটা ভেবে তো বিয়ে করার চিন্তাই আমি করতে চাই না।

স্নিগ্ধার মুখ বিষাদে মলিন হয়ে গেলো।

বললো, বেশ তো। আমি কিছু করতে পারি এই ব্যাপারে ? কি করতে পারি বলুন ?

অনেক কিছুই করতে পারো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র এবং প্রত্যেক বাঙালী প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করো, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। তাঁদের যদি এতটুকু দূরদৃষ্টি না থাকে তাহলে বলতে হবে যে তাঁরা নিজেদের স্বখাত সলিলেই ডুবে মরবেন একদিন।

আচ্ছা। আমি কথা দিচ্ছি যে আমি কলকাতা ফিরেই এ নিয়ে কিছু করব। তবে কতটুকু কি কবতে পারবো জানি না। আমাদের প্রজাতিব মতো এমন অদূর-দৃষ্টিসম্পন্ন প্রজাতি সত্যিই নেই। ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে এ বাবদে কিছু এখুনি কবা দরকার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কলকাতা শহরই তো আর বাঙালীদেব নেই। নিজেদেবই দোষে। কী না ছিলো তাদের ? চা বাগান, কলিয়ারি, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত বাড়ি, ব্যবসা। এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারের জাত বাঙালী। কলকাতায় ক'জন বাঙালী থাকবে আর পঁচিশ বছর পরে আপনি দেখে নেবেন।

আমার দেখার কি দরকার ? আমি তো উত্তরপ্রদেশীয়ই হয়ে গেছি। আমাদের কলকাতার কেয়াতলার বাড়ি কেনবার জন্যে এখানে পর্যন্ত চলে আসছে মাড়োয়ারি গুজরাটি ব্যবসাদারেবা। আমিই একমাত্র শরিক। এমন দাম দিচ্ছে যে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু আমি বিক্রি করিনি। ভাবছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দেবো লাইব্রেরি করাব জন্যে। তবে সব বিশ্ববিদ্যালয়েই তো এখন রাজনীতির চাষ। পড়াশুনার পরিবেশই তো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কি করব ভেবে পাই না।

সত্যিই তাই। মাও সেদিন বলছিলেন সে কথা। কেন যে এই সর্বনাশা দৃষ্টিভঙ্গি ? কে জানে ?

যাকগে। আমাদের হাতে কতটুকু ক্ষমতা। কীই বা করতে পারি আমরা ? রাজনীতি এখন একটা প্রফেশান হয়ে গেছে। স্পেশ্যালিস্টরা আর বিশেষ বিশেষ ইজম-এ বিশ্বাসী এবং পার্টির সদস্য ছাড়া দেশেব কথা ভাবার অধিকার নেই অন্য কারোই। অথচ আমরাই দেশ। ভাবলে, চোখ ফেটে জল আসে।

চাঁদু বললো।

আপনি সেই গানটি শোনাবেন না নিধুবাবুর ?

স্নিগ্ধা বললো।

এমন সময় সুরজ এলো। স্নিগ্ধাকে দেখে একটু অবাক হলো।
বললো, পররনাম।
প্রণাম। বললো স্নিগ্ধা, হেসে।
নিমকি ঔর চায়ে বানানা আচ্ছাসে।
জী সাব।
কে খাবে নিমকি ?
স্নিগ্ধা বললো।
আমরা খাবো। ফারস্টক্লাস নিমকি বানায় সুরজ। খেয়েই দ্যাখো।
কিছু বললো না স্নিগ্ধা।
তারপর বললো বিকেলেও এই পরেই যাবেন প্যাণ্ডেলে ? এই পাঞ্জাবিটা কে বানিয়ে দিয়েছে আপনাকে ? ভালো না একদম। আপনার জামাকাপড় কোথায় থাকে দেখি। আমি বেছে দিচ্ছি কোন্‌টা পরে যাবেন।
চাঁদু অভিভূত হলো। কিন্তু বললো, লজ্জা নিবারণ হলেই হলো আর কী।
প্যাণ্ডেলের সমবেত মহিলাবৃন্দর আপনার উপর মনোযোগ দেখে ব্যাপাবটা যে লজ্জা নিবারণেরই মাত্র তা তো মনে হলো না।
আমি সকলের মনোযোগ কখনওই চাইনি।
তবে ?
একজনের মনোযোগ চাই।
পরক্ষণেই কথাটা ঘুরিয়ে বললো, চাই তো একজনকেই মাত্র। সকলকে দিয়ে কি হবে আমার ?
সকলের মধ্যেই তো একজন থাকে।
আমি যাব মনোযোগ প্রত্যাশী হবো সে ভিড়েব মধ্যেব মানুষ নয়। আমিও তো ভিড়ের নই।
ওঃ। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস দেখছি আপনার। চলুন। নিয়ে চলুন। অতজন মহিলার সামনে আপনি খারাপ পোশাকে গেছিলেন সেটা সকালে আমার একদম ভালো লাগেনি।
চাঁদু ওকে সঙ্গে করে ওয়াড্রোবের সামনে নিয়ে গেলো। বেডরুমে।
স্নিগ্ধা বললো, একা মানুষ। এতবড় ডাবল-বেড দিয়ে কি করেন ?
কুস্তি করি। আমার শোওয়া খুব খারাপ। চরকি খাই বিছানাতে।
বিছানায় অবশ্য একজনেরও শোওয়ার জায়গা দেখছি না। সবই তো বইয়েই ভর্তি। বসবার ঘরে বই, পড়ার টেবলে বই, শোবার বিছানার মাথার কাছে,

খাটের আর্ধেকটাতে বই, আপনাকে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে কোনোদিনও বিয়ে করবে না। মানুষ সতীন তবু সহ্য করা যায়, ইন-অ্যানিমেট অবজেক্টকে সতীন হিসেবে কোনো আধুনিক মেয়েই সহ্য করবে না।

আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে একখাটে শোবই না।

মানে ?

মানে, সর্বক্ষণ শোব না। স্ত্রী তো বড় তাড়াতাড়ি পুরোনো হয়ে যাবে তাহলে। শেষের কবিতার অমিত আর লাবণ্যর মতো দু বাড়িতে থাকবো দুজনে। পূর্ণিমার রাতে দেখা হবে। মধ্যে ছোট্ট লিলিপুল। জ্যাপানিজ গার্ডেন। শালুক, পদ্ম। ডাহুক নেচে বেড়াবে পদ্মপাতার উপরে।

হয়েছে। এবারে থামুন স্বপ্নবিভোর চাঁদু। দেখি। হ্যাঁ এই পাঞ্জাবিটা।

সবুজ আর সাদা স্ট্রাইপ। আব এই সবুজ ধাক্কা পাড়ের ধুতিটা পরতে হবে সঙ্গে।

অ্যাঁ ? ধুতি ?

ইয়েস। যা বলছি তা শুনতে হবে। বাঙালী হয়ে পুজোর দিনেও পায়জামা পরতে লজ্জা করে না ?

তারপর হ্যাঙ্গারে ঝোলানো পাঞ্জাবি ও শার্টগুলো নেড়ে-চেড়ে বললো, আর এই পাঞ্জাবিটা পরবেন কাল সকালে। আর এই ধুতিটা। কালই তো অষ্টমী। তাই না ? আর পরশু...

মরে যাবো। চাঁদু বললো। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে মোটর সাইকেলে। কুকুরে পায়ে কামড়ে দেবে।

পুজোর কদিন মোটর সাইকেল চডতে হবে না। আমি যা বলছি, শুনতে হবে।

চাঁদু কী করবে বুঝতে পারছিলো না। এত জোর এলো কোথা থেকে স্নিগ্ধার তার উপর ? কিসের জোর এ ? এই জোরের মানে কি.... ?

এবার চলুন বসার ঘরে গিয়ে বসি।

চলো। আমি একটু রান্নাঘরে ঘুরে যাই।

বাবাঃ। রাঁধতে তো জানেন শুধু ওমলেট।

তুমি রাঁধতে জানো ?

জানি। কিন্তু রাঁধতে ভালো লাগে না আমার। কখনও সখনও আমি যাকে ভালোবাসব তার জন্যে কোনো বিশেষ রান্না, ছুটির দিনে....। দেখা যাবে তখন। এখন ভাবি না ওসব। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে। বেশি কিছু

কল্পনা করতে নেই। শুধুই দুঃখ পেয়ে মরতে হয়।

বসবার ঘরে চাঁদু ফিরে আসতেই ইমরান গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো। সঙ্গে হেমমাসি। চিত্রা আর শুক্লাও।

চাঁদু দরজা খুলতেই হেমমাসি বললেন, ভাবলাম, দেখে যাই চাঁদুর বাড়ি। কিরণকে গিয়ে গল্প করতে হবে তো।

বাঃ। কী সুন্দর পরিবেশ। রাতে অবশ্য ভালো বোঝা গেলো না। এখানেই তো থাকতে পারতাম বাড়ি ভাড়া না করে।

চিত্রা বললেন।

সে তো আমার সৌভাগ্য। আরও কতদিন থাকতে হয় এখানে তা কে জানে ?

বাকি জীবনটাই হয়তো এই রানীওয়াড়াতেই কেটে যাবে। অবশ্য পরে হয়তো এর চেয়েও ভালো এবং বড় কোয়ার্টার্রি পাবো।

চিত্রা পরে ঢুকলেন। বললেন, বাইরে গেটের পাশে ও দুটো কি গাছ ? অগ্নিশিখা, না ?

আফ্রিকান টিউলিপ।

ঐ তো। এই গাছই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে লাগিয়েছিলেন। নাম রেখেছিলেন "অগ্নিশিখা।"

সুরজ চা আর নিমকি নিয়ে এলো। চাঁদু বললো, আরো চা।

তোর ছোড়দা কই রে ?

শুক্লা শুধোলো স্নিগ্ধাকে।

তোমার জন্যে আতর কিনতে গেছে মীর্জাপুরে। কত আতর কিনছে কে জানে বাবা।

ভালো লোকের সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছিলে মা আমার। পুজোর দিন। ভাগ্যে আমার নিজের মা বেঁচে নেই। থাকলে আত্মহত্যা করতেন।

অমন বর পেয়েছিস! তোর ভাগ্য।

যা বলেছো। সেই রামকুমারবাবু একটা গান গান না সেই রকম আর কী। "গায়ে মাখে ছাই উমারে মাখায়, সিদ্ধি ঘুঁটে খায় বলদে চরায়" সেই রকমই বর আমার।

আপনার ড্রেসিং-টেবলে কোনো পারফ্যুম দেখলাম না কেন ?

স্নিগ্ধা শুধোলো চাঁদুকে

ছেলেরা আবার পারফ্যুম মাখে নাকি ?

পারফ্যুম রেস-এর ঘোড়ারাও মাখে। পারফ্যুম কি মাখে মানুষ নিজের জন্যে ? যাদের কাছাকাছি যাবে সে, তাদেরই খুশি করার জন্যে। ও। একটা ওডিকোলোনের শিশি দেখলাম বটে।

ওঃ। সে তো জ্বর হলে মাথায় জল-পটি লাগাবার জন্যে।

চিত্রা বললো, লাগাতে আসে কে ?

প্যাগুেলে যে সুন্দরীদের দেখলুম তাদের মধ্যে অনেকেই আসে বোধহয়।

শুক্লা বললো।

নাঃ। নিজেই লাগাই।

দ্যাখ, দ্যাখ ছেলের আমার কত গুণ। একেই বলে স্বাবলম্বী।

চাঁদু স্নিগ্ধার দিকে চেয়ে বললো, বলতে ভুলে গেছিলাম, ওমলেট ছাড়া বার্লিও বানাতে জানি। জ্বর হলে, লোক না থাকলে, বানিয়ে খাই।

বেচ্চারা। একটা বউ-এর সত্যিই দরকার।

চলো মা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার আরতি দেখা হবে না।

দাঁড়া। চাঁদু কী মনে করবে ? ওর বাড়ি এক কাপ চা না খেয়ে গেলে ? কাল কিন্তু দুপুরে আমাদের ওখানে তোমার নেমন্তন্ন। তাড়াতাড়ি সকলে এসে অঞ্জলি দিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে ধরে নিয়ে যাব।

বিন্দিয়াকেও নিয়ে যাবো মা।

স্নিগ্ধা বললো।

কে বিন্দিয়া ?

আরে ! সকালে মণ্ডপে আলাপ হলো না। ভারী দুঃখী মেয়ে।

বলেই চাঁদুকে বললো, চিঠিটা আবার নিতে ভুলে যাবেন না যেন। মনে করিয়ে দিলাম।

চাঁদু বললো, আমি তাহলে জামা-কাপড় ছেড়ে আসি।

হেমমাসি বললেন নিশ্চয়ই। আমরা তো এতো লোক রয়েছি। যাও যাও।

ওরা যখন প্যাগুেলে পৌঁছলো তখন আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। রানীওয়াড়ার দুজন বিখ্যাত আরতি করার জন্যে। পুরুতমশাই নিজেও করেন। উত্তরপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। চেহারা দেখলে ভক্তি হয়। চমৎকার সংস্কৃত উচ্চারণ। দীর্ঘদেহী। চমৎকার গড়ন শরীরের। মুখ চোখ নাক থেকে পায়ের পাতা এবং হাতের আঙুল পর্যন্ত। পুরুতমশাই-এর আরতি শেষ হলে স্টোরস-এর বিবেক দাশ এবং গ্রিড ডিপার্টমেন্টের ভূপত সিং আরতি করে। ওদের দেরি হয়ে যাওয়াতে আরতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিবেক ওরা গিয়ে পৌঁছবার একটু

পরই শেষ করলো। তারপর ভূপত আরম্ভ করলো। অনিমেষবাবু, যিনি ছেলেমেয়েদের বাংলা পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন, তাঁর ছোট শালা কোলকাতা থেকে এসেছে। উত্তর কলকাতায় থাকে। চণ্ডীদাস মাল মশায়ের কাছে গান শেখে। সে আরতির পর আজ আগমনী গান গাইবে।

হেমমাসিমারা সকলে এক সারিতে বসেছেন পেছন দিকে। সামনে চেয়ার আর খালি নেই। ট্যাক্সিতেই ভরতের চিঠিটা চাঁদু স্নিগ্ধাকে দিয়ে বললো তোমার পক্ষেই দেবার সুবিধা। সুযোগ বুঝে এবং ওঁর বাবা ধারে কাছে নেই দেখে দিয়ে দিও। আমার নামের খামটা ছিঁড়ে ফেলো এখনই।

চিত্রা বললেন, কিসের চিঠি চালাচালি হচ্ছে?

স্নিগ্ধা বললো, প্রেমপত্র কেউ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দেয় আগে জানিনি কখনও।

চাঁদু অবাক হলো। ভগাদা একাই ভোগলা দেয় না। তাঁর বোনও কম যান না।

অন্য সকলে ব্যাপাবটি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ওঁরা কি ভাবলেন কে জানে। ইচ্ছে করেই স্নিগ্ধা কথাটা এমন দ্ব্যর্থকভাবে বললো যে অন্যেরা অন্য কিছু ভাবতে পারেন।

ভূপত প্রায় পনেরো মিনিট আরতি করলো। বাঙালীদের আরতির মতো নয়। লম্ফ-ঝম্ফ একটু বেশি। তবে ধূপ-ধুনোর গন্ধ, ঢাকের বাজনার ছন্দ সমবেত সুবেশ নারী পুরুষ শিশুদের কলধ্বনি সব মিলে মিশে নেশা নেশা লাগে আরতির সময়। এই জিনিসই আর একটু প্রলম্বিত করলে অ্যাডিক্সনের পর্যায়ে আসতে পারে বলে মনে হয় চাঁদুর। ড্রাগ-এর অর্জির মতো, সেক্সুয়াল অর্জির মতো ধর্মকেও ইচ্ছে করলে অর্জির পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। ধর্ম বলতে রিচুয়ালস-এর কথা বলছে। চাঁদু ধর্ম মানে না, রিচুয়ালস মানে না, কিন্তু কোনো অদৃশ্য নিরাকার শক্তি সম্বন্ধে ওর মনে একধরনের অস্পষ্ট ধারণা আছে যা স্পষ্টতার কাছাকাছি। তাকেই ও ঈশ্বর বলে জানে। অনেকেই ধর্ম বা রিচুয়ালস-এ বিশ্বাস করা এই নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটাকে গুলিয়ে ফেলে। মিছিমিছি তর্ক বাধিয়ে জল ঘোলা করে। চাঁদু রবীন্দ্রনাথের গানে যে কথা আছে : "ওদের কথায় ধাঁদা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি, তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি" এতে বিশ্বাস করে। অঞ্জলি-টঞ্জলি ও বড় হবার পর থেকে কখনই দেয়নি। কিন্তু যাঁরা দেন তাঁদের বিশ্বাসকে আহত করারও কোনো চেষ্টা করেনি। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস তার নিজের। এই

নিজস্বতায় নাস্তিকের যতখানি অধিকার, আস্তিকেরও ঠিক ততখানিই।

অনিমেষবাবুর শালা গান গাইতে বসলো আরতি শেষ হবার পর। বেশি বয়স নয়। এবারে এম-এ পরীক্ষা পাশ করেছে। বেশ হিরো হিরো চেহারা। নামী আর্টিস্টরা যেমন কায়দা করে শাল জড়িয়ে স্টেজে বসে মাইকটাকে কোনাকুনি করে নিয়ে মাইক-ফিটিং গলায় গান করেন তেমনই কায়দা টায়দা।

প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করলেই গায়কের আট আনা গায়কত্ব ধরা পড়ে। বাকি আট আনা পরে। ভারী সুন্দর গানের কথাগুলি। এই আগমনী গানও বাংলাব এক নিজস্ব সম্পদ। আগমনী গান যে কাকে বলে তাই-ই জানবে না পরেব প্রজন্মের বাঙালী ছেলেমেয়েরা। বাংলায় বসবাসকারী ছেলেমেয়েরাই। ছেলেটির নাম সমরেশ ঘোষ। চেহারাটিও বেশ। প্রথম গানটি ও গাইলো .

"দ্যাখো না নয়নে গিরি গৌরী তোমার সেজে এলো
দ্বিভুজা ছিলো যে উমা দশভুজা কবে হলো।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী আর কার্তিক গণপতি
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী চারিদিক করেছে আলো ॥
দ্যাখো না নয়নে গিরি গৌবী তোমার সেজে এলো ॥"

চমৎকার গাইলো গানটি। পুজো মণ্ডপের মধ্যে, প্রতিমার সামনে বসে গাওয়া গানে যেন মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো।

এর পরে যে গানটি গাইলো সমরেশ, সেই গানটি রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে ও ক্যাসেটে শুনেছে চাঁদু। তবু, প্রতিমার সামনে বসে আগমনী গান শোনার একটা আলাদা ইমপ্যাক্ট আছে।

"গিরি একী তব বিবেচনা…

গানটি শুরু করতেই শুক্লা বললেন হেম মাসিকে, এই গানটির কথাই তোমাকে বলেছিলাম মা!

'গিরি! একী তব বিবেচনা
গেল সম্বৎসর হয় না অবসর
গৌরী আমার কথা মনে তো পড়ে না।
গিরি একী তব বিবেচনা।
রাজার মেয়ে উমা জামাই ভিখারি

লোকমুখে শুনে সদা দুখে মরি
আবার নাকি শিব ত্রিশূল ডমরুধারী
শ্মশানাধিকারী ঘরে থাকে না, থাকে না, থাকে না।
গিরি একী তব বিবেচনা...
গায়ে মাখে ছাই, উমারে মাখায়
সিদ্ধি ঘুঁটে খায়, বলদে চরায়
মরণ নাই শিবের নাম মৃত্যুঞ্জয়
পাষাণ হৃদয় বাঁচে না, বাঁচে না, বাঁচে না
এ কী তব বিবেচনা।
গিরি একী তব বিবেচনা !'

বাঃ। বাঃ। সাধু ! সাধু !

কে যেন বলে উঠলো পেছন থেকে।

চাঁদু চমকে উঠলো। পেছনে তাকালো। দেখলো ভগাদা চাঁদুর একটি ট্রাউজার এবং ফুল হাতা ছাই-রঙা হালকা ফ্ল্যানেলের জামা পরে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

শুক্লা বললেন, তাও ভালো। শ্মশানাধিকারীর উমাকে মনে পড়লো।

ভগাদা বললো। তোমার জন্যে আতর এনেছি। রাতে দেবো।

বলেই, চুপ করে গেলেন।

চাঁদুকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে একটি ছোট্ট শিশি দিয়ে বললেন, এটা তোর জন্যে। এর ব্যবহারবিধি আছে। সুনির্মল বসুর সেই ছারপোকা বিধ্বংসী পাঁচন আবিষ্কার-করা বিজ্ঞানীর গল্প পড়েছিলি ?

না তো !

ছোট ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশিতে লাল-নীল ওষুধ বিক্রি করতেন। সঙ্গে মোড়ানো কাগজে ব্যবহার-বিধি লেখা থাকতো। "সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, মুখ হাঁ করাইয়া এক ফোঁটা গিলাইয়া দিবেন। মৃত্যু অনিবার্য।"

চাঁদু হেসে উঠলো ভগাদার কথা শুনে।

সমরেশ আরেকটা গান ধরেছিলো। গোলমাল হবে মনে করে ভগাদাকে নিয়ে চাঁদু প্যাণ্ডেলের বাইরে এলো।

ভগাদা বললেন, যখন কোনো মেয়েকে আদর করবি তখন এক-ফোঁটা তোর দু হাতের তেলোতে নিয়ে ঘষে নিয়ে শ্রীঅঙ্গে লাগিয়ে দিয়েই নাক গুঁজে পড়ে

থাকবি। বেহেস্ত্ এর পরীরা তোর ঘ্রাণেন্দ্রিয়র সমস্ত ছিদ্রানুছিদ্র ভরে দেবে। আরে আদর তো সব শালাই করে! ব্যাপারটাকে একটা আর্টের পর্যায়ে না তুলতে পারলে লাভ কি? আমরা তো আর জন্তু-জানোয়ার নই। এক শিশি পগাকেও দেবো। অবশ্য ওকে না দিয়ে চিত্রাকেই দেবো ভাবছি। বেরসিকে এর মর্ম বুঝবে না। চিত্রাকে ব্যবহার-বিধি বলে দেবো।

আপনি! চিত্রাকে?

ইয়েস্। দোষের কি? ওতো মাইনর নয়। আমিও নই। পগাও নয়। রোজকার জীবনে নতুনত্ব আনতে যে পারে সেই হচ্ছে আর্টিস্ট।

এই আতরটার নাম কি?

রুহ্খস্স্। এই আতর ব্যবহার করবি হোলির দিন থেকে দশেরার দিন পর্যন্ত। গরমের সময়ে ব্যবহার করার আতর এ। কালকে অন্য একটা শিশি দেব। একসঙ্গে প্যাকেট করা আছে বলে খুলিনি। সে আতবের নাম অম্বর। শীতকালের জন্যে। রুহখ্স্ দেখতে সবুজ। আর অম্বর দেখতে হুইস্কি-কালারের। ভালো আতর মাত্রই কনসেন্‌ট্রেট। আজে-বাজে দোকানি তেল মিশিয়ে পাতলা করে ওজন বাড়ায়। বুঝলিরে চেঁদো, এই যে তোর ভগাদা দিয়ে গেলো, জিনিসের মতো জিনিস যতবার ইস্তেমাল করবি ততবার দাদাকে মনে করবি। নইলে তোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গেঁটেবাত হবে আমার অভিশাপে। বলে দিলুম।

ফিরলেন কখন? আর গেছিলেনই বা কোথায়? সুরজ সব দেখাশোনা করেছিলো তো?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তবে মুন্নীজানের ওখানে ধুতিটা খুলে ফেলে আর ঠিকমতো পরতেই পারলাম না। শুক্লা পরিয়ে দিয়েছিলো তো সকালে। দেখলাম, তোর ট্রাউজার আর জামা ফিট্ করে। চান করে পটাপট দুটো নীট হুইস্কি মেরে দিয়ে চলে এলাম পুণ্যস্থানে পাপ ক্ষালন করতে।

অবশ্য তোদের কাছে পাপ। আমার কাছে সবই পুণ্য। মানুষ হয়ে জন্মানোই সবচেয়ে বড় পুণ্য।

তো মীর্জাপুর দেখলে কেমন? আমি তো কতবার পাস করেছি। তোমার মতো "সার্ভে" তো আর করিনি!

আররে মীর্জাপুর একটা জায়গা মাইরি। লক্ষ্ণৌকেও হার মানায়। ওয়াজিদ আলী শাহর জায়গা হলে কী হয়? মুন্নীজান নাম মেয়েটার। বয়স হবে উনিশ-কুড়ি। ফিকে গোলাপি-রঙা সালোযার-কামিজ পরে ছিলো। লম্বা

বিনুনি। সোনালি জরি দিয়ে বাঁধা। সেও নাচছে, বেণীও নাচছে সাপের মতো। আর কী গান! কদর-পিয়া ঠুংরী গাইলো। কী ওধাও কী বন্দীশ! কী মুড়কি। আহা! পায়ের গড়ন কী? যেন শালী চাইনীজ মেয়ে। শিশুকাল থেকে পায়ের আঙুলগুলিতে যেন লোহার জুতো পরিয়ে রেখেছিলো কেউ র‍্যা। পাশে বাড়তে দেয়নি মোটে। খানদানী বাইজীদের পা ঐরকমই হয়। একটি আঙুলের সঙ্গে অন্য আঙুলের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। হ্যাঁ! গানেওয়ালী হো, তো অ্যায়সীই। দিল খুশ হো গায়া ইয়ার!

নে তোর জন্যে পান এনেছি। জর্দা খাস তো? আমিও আজ দুটো পান খাব। জর্দাও। হুইস্কি খেয়ে এসেছি আধ-বোতল। ওখানেই। তারপর অন্য একটা বোতল থেকে তোর ওখানে। মুন্নীজান আর্ধেক খেলো আমি আর্ধেক। আমার বাড়ির লোকে কিছু মনে করবে না কেউই। তা তোদের এখানে ধোওয়া-তুলসী-পাতা জাত-পাত সর্বস্ব ছুঁত-মার্গীর তো অভাব নেই। আমার জন্যে তোর ইজ্জতটা কেন যায় বল? নে। একটু বেশি করে' জর্দা দে তো। হুইস্কির গন্ধটা মেরে দেবে।

জর্দা খান আপনি? হেঁচকি উঠবে যে!

দুসস শালা। দেশ-বিদেশের কত যুবতী আস্ত আস্ত গিলে ফেলুম হেঁচকি উঠলো না আর তোর মীর্জাপুরী জর্দা খেয়ে হেঁচকি উঠবে। যাই বলিস চেঁদো। আমার দেশের মতো দেশ নেই রে। শিবাজীরাও মাল্‌তিদের মতো সরল মানুষ, এমন জর্দা-পান, মুন্নীজান, তোর মতো তিরিশ বছর বয়সের সতী, ক্যালানে ছেলে এসব এই ভারতবর্ষেই সম্ভব। এই আগমনী গান। শুক্লাকে নিয়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু শিগগিরিই ফিরে আসব। নিজের দেশে গরিব হয়েও থাকা ভালো। স্বদেশ স্বদেশই! কী বল?

তা ঠিক! তবে এতগুলো হুইস্কি খাওয়া কি ঠিক হলো?

দূর। দূর। যে শালারা গুনে গুনে মাল খায় সে শালারা মহা-খচ্চর হয়। তুই কি অ্যাকাউন্ট্যান্ট নাকি। গোনার ভার যাদের উপর তাদের কাজ তাদের দে। ওঁরা গোনেন। আর আমি হলাম গুণিতক্‌। বুয়েচিস্‌।

ওঁরাই ট্যাক্সিতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন চাঁদুকে। বললেন, কাল যখন অঞ্জলি দিতে আসবেন তখন একেবারে চাঁদুকে তুলে নিয়ে পুজো মণ্ডপ হয়ে শিউপুরায় ওকে নিয়ে চলে যাবেন। সন্ধেবেলা আরতি দেখার পর চাঁদুর বাড়ি গান-বাজনার আসর বসবে। ঝাঁজীকে বলে রেখেছে চাঁদু। স্নিগ্ধাও বলেছে। বলেছে যে বাড়ি ফেরার পথে পৌঁছে দিয়ে যাবে ওরা।

জামা-কাপড় ছেড়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে শোবার সময়ে শ্যামলদার চিঠিটা নিয়ে এসে মাথার কাছের আলোটা জ্বালিয়ে নিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলো ও।

অফেনবাখ,
ফ্রাঙ্কফুর্ট

মাই ডিয়ার চাঁদু,

তোকে এতবার করে বললাম, তুই গায়েই নিলি না। তুই দেশে ফিরে গেছিস প্রায় সতেরো আঠারো মাস হতে চললো।

আগামীবার পুজোর সময় চলে আয়। তোকে সময়মতো sposorship পাঠাবো। ঐ সময়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে "বুক মেস্‌সে" অর্থাৎ বুক-ফেয়ার হয়। পৃথিবীতে অত বড় বইমেলা আর কোথাওই হয় না। কলকাতার ধুলো-গিজ গিজ বইমেলা নিয়ে তোরা লাফাস, এখানে এসে দেখে যা একবার বইমেলা কাকে বলে। তাছাড়া এখানে "রাইন-মাইন ক্লাব" আছে বাঙালীদের। মিনিয়েচার প্রতিমা আনাই আমরা কুমারটুলি থেকে।

গত বছর পুজোর সময় তো কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা বাঙালী সাহিত্যিকও এসেছিলেন। "রাইন-মাইন ক্লাব" তাঁদেরও পুজো দেখার নেমন্তন্ন করেছিলেন। এবং ক্লাবের সভ্যরা আতিথেয়তারও ত্রুটি করেননি।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ছিলো আমাদের। এখনকার সাহিত্যিকদের দেখে ও তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সেইরকম বোধ কিন্তু জাগলো না। কে জানে, হয়তো আমার বয়স হচ্ছে বলে চোখই বদলে গেছে। ভক্তি বা সম্ভ্রম জাগানোর মতো মনে হলো না তাঁদের মধ্যে একজনকেও। সাহিত্যিকদেরও ডি-জেনারেশন হয়েছে বোধ হয়। যেমন হয়েছে আমাদের জেনারেশানের প্রত্যেক মানুষেরই।

তুই এলে দেখবি আমরাও কেমন পুজো করি। পুজোর তিনটি দিন দশ বাড়ি থেকে খিচুড়ি রান্না করে এনে সেই খিচুড়ি একসঙ্গে করে পরিবেশন করা হয়। কেউ করে আনে আলু ভাজা, কেউ ঘ্যাট, কেউ অন্য কিছু।

অবশ্য জার্মানির প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আমরাই বোধ হয় লাস্ট অফ দ্যা মোহিকান্স। জার্মানিতে নতুন করে ভারতীয়দের পক্ষে সেটল্‌ করা মুশকিল এখন। আমাদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত বাঙালী সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান সব কিছুর সঙ্গেই আমাদের ছেলে-মেয়েদের সংযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের ছেলে-মেয়েরা বাংলা বলতেই পারে শুধু। পড়তে পারে না। জার্মান বলে, মাতৃভাষারই মতো। জার্মান ও ফ্রেঞ্চ জানে। অবশ্য শুনি এখানে বসেই যে দেশের উচ্চবিত্ত সমাজের ছেলে-মেয়েরা, যারা ভালো শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পায় তারাও নাকি সবাই সাহেব হয়ে যাচ্ছে ও গেছে ? ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বলে। বাংলা গান শোনে না, বাংলা বই পড়ে না, বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে নাকি তাদেরও আর কোনো যোগ নেই। চিন্তাশীল, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালীরা এই সাংঘাতিক সাংস্কৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধে কিছু কি ভাবছেন অথবা করছেন না ?

দুর্গাপুজোও আমরাই করছি। হয়তো শেষ জেনারেশান। আমাদের ছেলে-মেয়েদের আমলে এসব আর থাকবেই না। বাঙালী বলে কোনো জাত, বাঙালী বলে কোনো সংস্কৃতি যে ছিলো তাই হয়তো ভুলে যাবে বাঙলার মানুষও। দেশেই যদি তোরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের সাহেব করে তুলিস তবে নিরুপায় আমাদের আর দোষ দিয়ে লাভ কি ?

যাই হোক, তুই যদি চাকরিতে সত্যিই interested থাকিস তো বল ? তোর যা কোয়ালিফিকেশান এবং বয়স তাতে চাকরি একটা যোগাড় করে দিতে যে পারবোই এমন কথাও দিতে পারি। তবে আসার আগে জার্মানটা খুব ভালো করে শিখে আসতে হবে। উপরি ফ্রেঞ্চটাও যদি শিখিস তো ভালো হয়। ওল ওভার ইয়োরোপে ইংরিজি না জানলেও চলে এই দুটি ভাষার অন্তত একটি না জানলে সত্যিই অসুবিধা। জার্মানিতে থাকতে হলে জার্মান তো জানতে হবেই।

কী করবি ভেবে জানাস। আমার এক বাঙালী বন্ধু, নাগপুরের ছেলে ; এখানে একটি খুব বড় কোম্পানির এক নম্বর। সম্পূর্ণ নিজের গুণেই এতো বড় হয়েছে। আর্লি ফিফটিজ্ এ জার্মানিতে এসে টেলিগ্রাফের তারে আর ট্রাম-লাইনের তারে শীতকালে মইয়ে চড়ে নুন ছিটোতো। ওর সঙ্গে কথা বলেই বলছি তোকে। এ ছাড়াও দিলিপ আছে। দিলিপ রায়চৌধুরী। মার্কেটিং-এর মস্ত লোক। দিলিপ চ্যাটার্জী বলেও এক বন্ধু আছে আমাদের। ক্ষৌণিশও আছে। ক্ষৌণিশ চৌধুরী, ভূপাল রায়, এবং আরও অনেকেই। ক্ষৌণিশ নিজের ইন্ডাস্ট্রিও করেছে। অবাঙালীদের মধ্যে চৌহান সাহেব আছেন। দিলিপেরই মতো উনি জার্মানদের ঈর্ষার কারণ। এত বড় ইন্ডাস্ট্রি ওর।

সত্যিই বলছি, চাকরি তোকে একটা করে দিতে পারব যদি তাড়াতাড়ি আসিস এবং সীরিয়াস হোস ঐ ব্যাপারে।

তুই শুনলে অবাক হবি যে এখানে যেসব বাঙালী ছেলে ক্যান্টার করে

বেড়াচ্ছে চাকরিতে ব্যবসাতে এবং প্রফেশানে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই কলকাতার কালীধন-তীর্থপতি-সত্যভামা বীণাপাণি-হিন্দু স্কুলের ছেলেরাই। ইংরিজি মাধ্যমের স্কুলের বড়লোকের ছেলেরা নিজেদের বকানোর মতো যথেষ্ট সঞ্চিত পয়সা বাবা-ঠাকুর্দা রেখে গেছেন বলেই হোক আর যে জন্যেই হোক, এখানে কেউই আসেনি। এলেও হালে পানি পায়নি। এই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি আমাদের সমাজে যাদের আমরা অর্থনৈতিক ও জাত-পাতের মানে নিচু বলে চিরদিন দাবিয়ে রেখেছি, হরিজন, নিম্নবর্ণর, উপজাতি, পাহাড়ী উপজাতি বলে, তাদের যদি একটু সুযোগ সুবিধে দেওয়া হতো তবে তারা তোর আমার চেয়ে একটুও কম বড় হতো না।

আমি তো দেশ ছেড়েছি সাঁইত্রিশ বছর। দেশ স্বাধীনও হয়েছে আজ চল্লিশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে চোখে পড়ার মতো কোনো উন্নতি কি এখনও দেশে হয়নি? চল্লিশ বছর তো কম সময় নয়! আমি রাস্তা ঘাট ব্রিজ ফ্লাই-ওভারের কথা বলছি না, বলছি, মানুষের কথা। হিউম্যান মেটেরিয়ালই দেশ গড়ে, যে-কোনো দেশ-এর প্রকৃত সম্পদ তারাই। সেই হিউম্যান মেটেরিয়ালের কতটা উন্নতি হযেছে তা জানতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশের দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার এঁরা কি করছেন এই বিষয়ে? সাহিত্যিকেরা কি এখনও পার্কের বেঞ্চে বসা মধ্যবিত্ত নায়ক-নায়িকার নেকু-নেকু-প্রেমের গল্পই লিখে যাচ্ছেন?

বাংলা কোনো বই-ই তো এখানে পাই না। একটি বাংলা লাইব্রেরিও নেই। আমরা এতোই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি এবং এতোই কাজ করতে হয় আমাদের যে সময়ও হয় না ঐ পুজো আর ক্রীসমাসের সময় ছাড়া দেখা-সাক্ষাতের। এখানেরই নয়, সমস্ত পশ্চিম জগতের জীবনই বড়ই বস্তুতান্ত্রিক। আর্থিক উন্নতি যতটা কাম্য এখানে, আত্মিক উন্নতি ততটা নয়। শুনতে পাই আমার নিজের দেশের মানুষেরাও নাকি আমাদের সব পুরোনো মূল্যবোধ ছুঁড়ে ফেলে, যা নিয়ে আমাদের গর্ব ছিলো তার সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে এসব দেশের মানুষেরই মতো চোখ বাঁধা বলদের মতো হয়ে উঠেছে। যে-উন্নতি মানুষকে আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি না দেয় তা যে উন্নতি নয়, তা এ-দেশে এত বছর থেকে খুব ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করেছি। ভালো থাকা, ভালো-খাওয়া, ভালো গাড়ি-চড়াকেই মানুষ হওয়া বলে না। হিটলারের ভাষায় একটি "স্পার্ক" দেবার মানুষও কি স্বদেশে একজনও নেই? সবাই-ই কি ঘুমুচ্ছেন?

লিন্ডাকে বিয়ে না করলে হয়তো দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আরও একটু বেশি

থাকতো। লিন্ডা ভারতবর্ষে এবং কোলকাতায় একেবারেই যেতে চায় না। বিয়ের পর একবার মাত্র গেছিলো। এ নিয়ে একবার ডিভোর্স হবার উপক্রমও হয়েছিলো আমাদের। যদিও পুজো-পার্বণে লাল পাড়ের গরদের শাড়ি পরে, আমার জন্যে খিচুড়ি প্রসাদ পর্যন্ত রেঁধে খাওয়ায় তবু দু'জনের মধ্যে একটি দিগন্তলীন সমুদ্রর ফারাক থেকেই যায়। বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে মজা-টজা করা ভালো কিন্তু বিয়ে করার সময়ে নিজের দেশের মেয়েই বোধ হয় বিয়ে করা ভালো। নিজের রাজ্যের না হলেও অন্য রাজ্যের হলেও, নিদেনপক্ষে নিজের দেশের।

আমার বড় ছেলে কার্ল এখন প্রাপ্তবয়স্ক। চাকরি করে। একা থাকে। মেয়ে ইন্দ্রাণী। এইরকমই চুক্তি ছিলো আমার আর লিন্ডার মধ্যে। এক সন্তানের নাম হবে জার্মান। আরেকজনের ভারতীয়। তবে ইন্দ্রাণী আর ইন্দ্রাণী নেই। ইন্দ্রা হয়ে গেছে। তার থেকে ইন্ডা। জার্মানে ইন্ডিয়াকে বলে "ইন্ডে"। তাও ভেবে আনন্দ পাই যে আমার মেয়ের নামের মধ্যে ইন্ডিয়া তাও বেঁচে থাকবে—মানে, বাঁচার কাছাকাছি অন্তত। তার বয়সও ষোলো হলো। তাকেও হারাবার সময় হয়ে এলো।

আমাদের জীবনে অনেক কিছুই বড় কষ্ট করে, যত্ন করে পেতে হয় তা নিশ্চিতভাবে হারিয়ে যাবে তা জেনেও। ভাবলে, ভারী অবাক লাগে। পশ্চিমী দুনিয়াতে আমরা ছেলে-মেয়েদের যে-ভাবে হারাই সেভাবে বোধ হয় সাহেবহওয়া ভারতীয়রাও এখনও হারান না। জীবন এখানে বড় একাকিত্বের। আত্ম-নির্ভরতা যেখানে মানুষকে জান্তব জীবনে ঠেলে দেয় সেখানে এই আত্ম-নির্ভরতার স্বরূপ নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে হয় আমার। পশ্চিমের মানুষেরা নতুন করে ভাবছেও।

আমিও রিটায়ার করব আর কয়েক বছর পরই। তারপর লিন্ডার খুব ইচ্ছা যে বাভারিয়াতে, অস্ট্রিয়ার বর্ডারে জার্মান আল্পস্-এর কাছে ছোট্ট একটি কটেজ এবং বিস্তর জমি নিয়ে বাগান করে কাটিয়ে দেবো বাকি জীবনটা।

চাঁদু, তোকে এ-দেশে আসতে বলছি বটে কিন্তু আজ পঁয়তিরিশ বছর দেশছাড়া বলেই এখন বুঝি,-নিজের দেশের কোনো বিকল্প হয় না। ভারতবর্ষের মতো দেশ হয় না। নিজের দেশে থেকে নিজের দেশকে বড় করে নিজের দেশে বড়লোক হয়ে দেশের মানুষের ভালো করে, ভালো ভেবে, জীবন কাটানোর তাৎপর্য এক আর অন্যের দেশে ঘোড়ায়-জিন-পরিয়ে নিরন্তর দৌড়ে বেড়িয়ে অনেক অর্থের মালিক হয়ে অত্যন্ত "উচ্চমানের" জীবনযাত্রার শরিক হয়েও এক

নিরর্থক যান্ত্রিক জীবন-যাপন করে চলা আর এক। স্বদেশের বোধ হয় কোনো বিকল্প নেই। আজ বুঝি যে, সময় মতো দেশে ফিরে গেলেই বোধ হয় ভালো করতাম।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা মানে থাকা দরকার। জন্মালে মানুষকে মরতে হয়ই। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকুকে ঠিক কীভাবে কাজে লাগানো উচিত সে সম্বন্ধে যখন মনে এক স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে থাকে তখন বড়ই দেরি হয়ে যায় বোধ হয়। জীবনের 'প্রায়রিটিজ' যারা অল্প-বয়সে স্থির করে নিতে না পারে তাদের পরবর্তী জীবনের সমস্ত প্রাপ্তিই বোধ হয় সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায়। বিশ্বাস কর্, চাঁদু, আমার শ্বেতাঙ্গিনী অনন্ত-যৌবনা সুন্দরী স্ত্রী লিন্ডা যখন একই খাটে শুয়ে ওর দিকের বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে জার্মান ঔপন্যাসিকের লেখা কোনো নবতম বই পড়ে আব আমি পড়ি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নয়তো শরৎচন্দ্র অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন আমার নাকে মসুর ডালে কাঁচালংকা-কালোজিরে সম্বার দেওয়াব শব্দ ও গন্ধ ভেসে আসে। কৈশোরের শান্তিনিকেতনের বসন্ত দিনের আম্রকুঞ্জ আর শালবীথির আমের-মুকুল আর শালফুলের গন্ধও নাকে ভেসে আসে। স্বপ্ন দেখি, মেঝেতে লুঙি পরে উদ্‌লা গায়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছি আব মা থক্‌থকে-করে-রাঁধা গোটা গোটা কাঁচালংকা-দেওয়া শর্ষে-ইলিশ বা দই-রুই বা শুক্তো, বা কুমড়ো দিয়ে সজনে-খাড়ার তবকাবি অথবা ইলিশমাছের মাথা দিয়ে রাঁধা কচুর শাক কিংবা রুই-এর মুড়িঘণ্ট পরিবেশন কবছেন আমাকে। ঠাকুমা পাশে বসে বলছেন, "আর দুগা ভাত লস্ না ক্যান ? তোর ড্যানা দুগা বড় শুক্‌না শুক্‌না দেখি রে ?"

চাঁদু। আমার অসীম ধন, বাভারিয়ার ফুলের বাগান, আস্ট্রিয়ান অ্যালশাসিয়ানের জলদ গম্ভীব ঘাউ-ঘাউ-এর স্বপ্ন যখন দেখি তখনও এক ধরনের অপরাধ বোধ জাগে মনে। দেশের লোকের মুখে শুনি আমার আলশাসিয়ান কুকুরের পেছনে আমার যা খরচ মাসে, একজন গড়পড়তা ভারতীয়ের বার্ষিক রোজগার তার একশ ভাগের এক ভাগ। এ কথা জেনে, মনে পড়ে আমার দু'চোখ জলে ভরে আসে। মনে হয়, দেশেই থাকা উচিত ছিলো। দেশের মানুষের সঙ্গে একাসনে বসে আমার খাবার ভাগ করে খাওয়া উচিত ছিলো। উচিত ছিলো দেশের যাতে প্রকৃত ভালো হয়, দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা যাতে ঘোচে তার জন্যে যা-কিছু করণীয় তার সব কিছু করা। আমার দুটি হাতেরও হয়তো প্রয়োজন ছিলো নিজের দেশকে গড়ে তুলতে। মানুষের

মতো মানুষে ভরে তুলতে।

যাই হোক। এখন আমার আর কিছু করার নেই। একটাই জীবন। জীবনের দাবার গুটি ভুল চেলে দিলে আর তা ফেরানো যায় না। এর চেয়ে বড় বাস্তব সত্য আর নেই।

তুই লিখেছিলি একবার চাকরির কথা। তাই-ই লিখলাম তোকে। সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিস। তবে এ-দেশে থাকিস আর নাই-ই থাকিস একবার বেড়িয়ে যা এসে। ট্রাভেলিং-এর চেয়ে বড় এডুকেশান, ইনভেস্টমেন্ট আর নেই। দেশের মধ্যেও সমস্ত রাজ্য ঘুরে ঘুরে দ্যাখ এক একটা ছুটিতে। যে মানুষ নিজের দেশকে না জানে ভালো করে, পৃথিবীকে না জানে মোটামুটি তার পক্ষে খোলা চোখে, খোলা মনে. বিচার করা সম্ভব নয়, বোঝা সম্ভব নয় নিজের দেশের অগ্রগতির মূল প্রতিবন্ধক কী এবং কীভাবে তা অপসারণ করা যায়।

ভালো থাকিস। লিন্ডা মাঝে মাঝেই তোর কথা বলে। লানডানে ডেপুটেশানে গিয়ে তো অনেক বাঙালী ও ভারতীয়ের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিলো ওর কিন্তু তোকে ও মনে রেখেছে সবচেয়ে বেশি করে। তোর গানের কথাও বলে। বলে, যদি বাংলা ভাষাটা জানতাম তবে "চান্ডুর" গানের মানে বুঝতাম এবং গানের কথার মানে বুঝলে গানকে আরও গভীরভাবে হৃদয়ে অনুভব করতে পারতাম। লিন্ডা বলে যে তুই নাকি "মোস্ট ওরিজিনাল অ্যান্ড আনপল্যুটেড বেঙ্গলি শী হ্যাজ এভার মেট টিল টুডে।" এই কথাটাই আমার দেশের বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষ বোঝে না। তারা বিদিশীদের নকল করেই তাদের কাছে সম্মানিত হতে চায়। "ওরিজিনালিটি" একজন মানুষকে যে সম্মান দিতে পারে তা নকল-করা মানুষ কখনওই পেতে পারে না। তুই এলে লিন্ডাও খুব খুশি হবে। খুব কম মানুষকেই ওর ভালো লাগে।

ভালোবাসা নিস।

ইতি—

তোর শ্যামলদা

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো চাঁদু। জিভে সেদিন সন্ধেতে সুরজের বানানো স্বাদু কুচো-নিমকির স্বাদের এবং জর্দা দেওয়া পানের রেশ লেগে থাকা সত্ত্বেও জিভটা তেতো হয়ে গেলো।

শ্যামলদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো গত বছর লানডানে। কেন জানে না, অসমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও এক ধরনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো ঐ দম্পতির সঙ্গে চাঁদুর। চিঠি হয়তো লেখেন তিন মাসে একটি। কিন্তু লিখলে এইরকমই

দীর্ঘ, আবেগময় আন্তরিক চিঠি। দেশকে ভালো যাঁরা বাসেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, ঠিকই বাসেন। আজ সন্ধেবেলায় ভগাদাও এইরকমই বলছিলেন। শ্যামলদাব আব ফেবার উপায় নেই। ভগাদার আছে।

॥ ছয় ॥

অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিয়ে হেমমাসিমারা চাঁদুকে সঙ্গে নিয়ে ইমরান-এব ট্যাক্সিতে শিউপুবায গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন বাজীরাও এবং মাল্‌তি তার শিশুপুত্র নিয়ে বারান্দাতে বসেছিল। ভগাদা সিঁড়িতে বসে বারান্দাব থামে হেলান দিয়ে তাদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিলেন। আব পগাদা বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট পডছিলেন। দু'হাতলে দু'পা তুলে দিয়ে।

চাঁদু যেতেই ভগাদা বললেন, তোরই বিহাফে আমি একদম ভোবে গিয়ে শিবাজীরাও অ্যান্ড ফ্যামিলিকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিলাম। তুই কত জামাকাপড দিয়েছিস ওদেব তা ওবা গর্বভবে আমাকে দেখাল। এই একটা কাজেব মতো কাজ কবিস তুই। আমিও যাবাব আগে ওদেব কিছু দিয়ে যাব। যা পাবি। এই শিবাজীবাও আর মাল্‌তিবাই কিন্তু আসল ভাবতবর্ষ। গত চল্লিশ বছরে এদের অবস্থাব তেমন কিছুই হেবফের হযনি। এবা না বড় হলে, এদেব অবস্থা না ফিরলে দেশেব প্রকৃত অবস্থাব উন্নতি হয়েছে যে, তা কখনই বলা যাবে না। কি বল? দিল্লি, বাঙ্গালোব, বম্বে, কলকাতা বা এলাহাবাদ বেনারস দেশের সচ্ছলতার ইনডেক্স নয়। শিবাজীরাওদের অবস্থাই হচ্ছে আসল ইনডেক্স। ইনফ্লেশন সব দেশেই হযেছে। কিন্তু বেশির ভাগ পশ্চিমী দেশগুলোতে গরিবস্য গরিবেরও একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। রোজকাব খাবাব দাবার, জামাকাপড, চিকিৎসাব বন্দোবস্ত এমন কি গাডি টিভি নেই এমন লোকের সংখ্যাও খুব বেশি নেই। নেইই বলতে গেলে। ওসব তো ছেডেই দিলাম, খাবারে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, পানীয জল, দুবেলা মোটা ভাত-কাপড়ের মিনিমাম নীডস্‌ও আমরা এতদিনেও পূরণ করে উঠতে পারলাম না এদেব। আসল ব্যাপারটা কি জানিস? গোডার সমস্যা? মূল সমস্যা? তা হচ্ছে জনসংখ্যার। যে সমস্যার মোকাবিলা করাব চেষ্টা কোনো শালার পার্টি আজ অবধি সিরিয়াসলি করেনি ভোটে হাত পড়াব ভযে। দেশকে কেউই ভালোবাসে না, পার্টিকেই ভালোবাসে। যে-রেটে জিওমেট্রিক প্রগ্রেশানে পপুলেশন বেড়েছে, বাডছে তাতে কোনোদিনও আমাদের দুর্দশা ঘুচবে না।

পগাদা বইয়েব থেকে মুখ না সবিয়েই বললেন, তার জন্যে তোব মতো

মানুষেরাই দায়ী। তোরা তো দেশের ব্যাপারে ইনভল্‌ভড্ নোস। টরোন্টোতে গিয়ে ফুটানি মারছিস। দেশের সাধারণ মানুষের শোকে চোখের জল ফেলছিস একমাসের জন্য এসে ?

আমি ? যাকগে। তোর সঙ্গে বাজে কথা বলে লাভ নেই, তোর "আওয়ার টাইমস"-এর দেশসেবার গল্প আমার কাছে করিস না। তোকে সত্যিই একদিন গুলি করে দেবো আমি পগা। ইদানিং তোকে আমি স্ট্যান্ড করতে পারি না। বাজীরাও আর মাল্‌তি, কথাবার্তা যে ওদের নিয়েই হচ্ছে তা বুঝতে পারলেও বাংলা-ইংরিজি কথা বুঝে উঠতে পারলো না। আবার ও অপরাধীর চোখে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

হেমমাসি বললেন, আহা ! বছ্‌ছরকার দিনে সকালবেলাতেই কী শুরু করলি তোরা। এসো মা। তুমি ভিতরে এসো। বলে, মাল্‌তির হাত ধরে হেমমাসি ভিতরে নিয়ে গেলেন মাল্‌তিকে তার শিশুপুত্র সমেত।

ভোজপুরী দরোয়ানেরা বাজীরাও চামারের এই হঠাৎ প্রোমোশনে বিরক্ত হয়ে চেয়েছিল। যে-কদিন ওঁরা আছেন দরোয়ানেরা নিজেরা সকলেই ওঁদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করছে। তাই কিছু বলার সাহস হলো না তাদের। অনেক বছরই অনেক জায়গা থেকে অনেক রইস্ আদমীরা পুজোর সময় বা শীতে এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকে গেছেন কিন্তু এরকম ছিটেল মানুষেরা কখনও যে আসেনি তা তাদের বিভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পেরেছিল চাঁদু।

ভগাদা বলল, তুই বোস চেঁদো। আমি চান সেরে আসি। আজ তুই খাবি বলে মা, দুই বৌ আর স্নিগ্ধা প্রত্যেকে একটা একটা করে পদ রান্না করেছে। তোর জন্যে আমিও একটু খেয়ে সুখ করে নেবো। চান করতে যাবার আগে ইমরান্‌কে বললেন, কেয়া ইমরান ? লায়া ?

জী হুজৌর।

লাও।

ইমরান বোতল বের করল। একটি জিনের, একটি হুইস্কির। প্যাণ্ডেলে ওদের নামিয়ে দিয়েই ঐ জন্যেই ইমরান চলে গেছিলো।

এইবারে কারণটা বুঝল চাঁদু।

কি দিয়ে খাবি ? বরফও নেই, বিটারস্‌ও নেই। লেবু, জল, আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে। কি বলিস ?

কাঁচালঙ্কা ?

আঁতকে উঠে বলল চাঁদু।

হ্যাঁরে। খাস্‌নি কখনও ? কাঁচালঙ্কার বিচিগুলো ফেলে দিয়ে শুধু লঙ্কাটিকে চিবে জিন বা ভড্‌কার সঙ্গে ফেলে দিয়ে খেলে তার মেজাজই, কিক্‌ই আলাদা। গন্ধবাজলেবুও যোগাড় করেছি। হুইস্কিটা আনিয়েছি রাতের জন্যে। গান-বাজনা হবে।

ওটা তোমার কাছেই থাক। আমি তো রোজ খাই না। কলকাতার কাস্টমস এবং এয়ারলাইনস-এর বন্ধুবান্ধবেরা যা যোগাড় করে দেয় তাই এখানে আসার সময় নিয়ে আসি। বাড়িতে কাউকে খাওয়াতে হলে তা দিয়েই চলে যায় ভালো হুইস্কি খাওয়াবো তোমাদের।

বলিস কী রে ? একেবারে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট ?

আপনারা তো ভি আই পিই। চাঁদু বলল।

তাই ?

ভগাদা ভিতরে যখন যাচ্ছেন, পগাদা বললেন এগারোটা বাজতে চলল। তোর মতো কোঁত-কোঁত করে গিলতে পারি না আমি। আমার জন্যে আর চাঁদুর জন্যে দুটো টল্‌-ড্রিঙ্ক বানিয়ে দিয়ে যা।

ওরে আমার পগারে ! দাদারে ! এখন বুঝি ভগার সঙ্গে খুব ভাব।

বলেই বলল, দিচ্ছি, দাঁড়া বানিয়ে। শিবাজীরাও তো মহুয়া খাওয়া পার্টি। ওর জন্যে দু বোতল বীয়ার কালই এনে কুয়োর মধ্যে একটা আলাদা বালতিতে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। দেখি গিয়ে শালার বোতলেরা এতক্ষণে ভেসে গেল বালতি থেকে, না কুয়োর তলায় ডুব মারল ! চাঁদু গিয়ে পগাদার পাশের ইজিচেয়ারে বসল। বাজীরাওকে চেয়ারেই বসতে বলল। কিন্তু ও বলল, দারোয়ানদের কাছ থেকে একটু খৈনী খেয়ে আসছে।

চাঁদু পাশে গিয়ে বসায় পগাদা বইটা নামিয়ে রাখলেন।

বললেন, এই ভগাটার জন্যে তোমার সঙ্গে তো ভালো করে আলাপই হল না। আমার মা, দুই বৌ আর বোন তো তোমার গ্রেট অ্যাডমায়রার হয়ে উঠেছেন। আমিই বা বাকি থাকি কেন ?

চাঁদু লজ্জিত হয়ে বলল, আমার মধ্যে অ্যাডমিরেশানের কী দেখলেন তা ওঁরাই জানেন।

কে যে কার মধ্যে কি দেখে তা কি বলা যায় !

তারপর বললেন, তুমি কি বি এস সি করে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলে ?

না। আমি বি এ করে তারপরে বি এসসি করি। তারপর গ্লাসগোতে গিয়ে··· চাঁদু বলল।

তুমি নাকি বছর খানেক হল ফিরেছ ইংল্যান্ড থেকে ?

সে তো এক বছরের জন্যে কোম্পানি থেকে বিশেষ ট্রেনিং-এব জন্যে পাঠিয়েছিল। দ্বিতীয়বার।

এখন তোমার বয়স ?

এখন তিরিশ। মানে হবে কয়েকদিনের মধ্যেই।

আমরা থাকতে থাকতে ?

না। আমার জন্মদিন উনত্রিশ তারিখে।

আই সী। একটু পরে বললেন তাহলে তো খুব কম বয়সেই পড়াশুনো শেষ করেছো বলতে হবে।

কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমার ইন্টারেস্ট ? মানে, জীবিকার বিষয়টি ছাড়া ?

চাঁদু এই প্রথম পগাদা সম্বন্ধে স্নিগ্ধার কাছে যা শুনেছিল এবং ভগাদা যা ক্রমাগত ভোগ্‌লা দিয়ে গোলমাল করে দিয়েছিল তা যে সত্যি সে সম্বন্ধে অবহিত হতে শুরু করছিল। সত্যি ! আশ্চর্য এক সম্পর্ক দুই ভাইয়ের মধ্যে। অনেক দাদা আর ভাই দেখেছে। জগাই-মাধাই। কিন্তু এই পগাদা-ভগাদার মতো কম্বিনেশন কখনওই দেখেনি। যেন, ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুমের কম্বিনেশন লক।

চাঁদু বলল, অনেক বিষয়েই। সাহিত্য, গান বাজনা দর্শন। আসলে তেমন ইন্টারেস্ট ছিল না। পগাদার 'আওয়ার টাইমস' ম্যাগাজিনে লেখা টেখা হয় বলে পগাদার মুখেই শুনেছিল তাই বলে দিল। ইমপ্রেস করার জন্যে। স্নিগ্ধার দাদা তো '

বাঃ ! শিক্ষিত মানুষদের যে সব বিষয়ে ইন্টারেস্ট থাকা উচিত। একটা কিছু তো জীবিকার জন্যে সকলকেই করতে হয় কিন্তু জীবিকার জন্যে তো জীবন নয়, জীবনের জন্যেই জীবিকা। এই কথাটাই নিরানব্বই ভাগ সংসারী মানুষ ভুলে যায়। তুমি অবশ্য এখনও সংসারী হওনি। বাই দ্যা ওয়ে, হওনি কেন ?

হইনি। মানে, বিয়ের কথা বলছেন ?

প্রিসাইস্‌লি।

মানে, ভাবার সময় পাইনি। তাছাড়া, বিয়ে করার মতো মেয়ে চোখে পড়েনি।

ঢ্যু মীন, আজ অবধিও না ?

পগাদা চাঁদুর দিকে মুখ না ঘুরিয়ে সোজা সামনের নিমগাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে দেখা-যাওয়া পাহাড়টির দিকে চেয়ে বললেন।

মানে··· । অত প্রিসাইস্‌লি বলছি না । আপনারা এখানে আসার আগে পর্যন্ত অন্তত চোখে পড়েনি ।

ওঃ । আই সী !

পগাদার চোখের কোণে যেন এক নীরব হাসির ঝিলিক্ খেলে গেল বলে মনে হল চাঁদুর । ধরা পড়ে গেল বলে লজ্জা পেলো ।

সাহিত্য সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ? মানে, সাহিত্য বলতে তুমি কি বোঝো ? ইন জেনারেল ? অর্ণব ?

এমন সময় খালি গায়ে বড় একটা সাদা তোয়ালে জড়িয়ে ভগাদা দু'হাতে দুটি গ্লাস নিয়ে বারান্দায় এলেন । সত্যিই টল্ ড্রিঙ্ক বানিয়েছেন । গ্লাস দুটো দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়েই বললেন, কিরে ? তুই কি ওকে তোর স্টক-কোয়েশ্চেনস্‌গুলো ঝেড়ে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছিলি নাকি পগা ? বেচারাকে দিন্‌টা এনজয় করতে দে ।

বলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, আরে শিবাজী রাওটা আবার কোথায় গেল ?

ও খৈনী খেতে গেছে ।

চাঁদু বলল ।

এলে, ভিতরে পাঠিয়ে দিস । ওর বীয়ার উদ্ধার করা গেছে । গিরিধারীর জিম্মায় আছে বলিস । গিরিধারী খুলে দেবে ।

গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে পগাদা বললেন, জার্নালিজম্ আর লিটারেচারের মধ্যে তফাত আছে বলে মানো কি তুমি ?

নিশ্চয়ই ! চাঁদু বলল । জিনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মনের জোর বাড়িয়ে ।

মানো ? ভেরী গুড ! জার্নালিজম্ আর লিটারেচারের মধে তফাত কি তা আমাকে বুঝিয়ে বলবে ? তোমার নিজের মতো করে । তুমি ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য বেশি ভালোবাসো ? না কনটেমপোরারি ?

অষ্টমীর দিনে নেমন্তন্ন খেতে এসে তো মহা বিপদেই পড়ল ও । কিন্তু কি করা যাবে ? স্নিগ্ধার দাদা ।

সত্যি বলতে কি ক্ল্যাসিক্যালই সব পড়ে উঠতে পারিনি । কনটেমপোরারি বলতে সকলের মুখে যে সব বই ভালো বলে শুনি সেগুলো জোগাড় করে পড়তে চেষ্টা করি । এখানে বই পাওয়াও কঠিন । এলাহাবাদের একটি দোকানে চিঠি লিখে আনাই । অ্যাকাউন্ট আছে ওদের সঙ্গে । মাঝে মাঝে গিয়ে থোক টাকা দিয়ে আসি ।

স্নিগ্ধা বলছিলো তোমার কোয়ার্টার-ভর্তি নাকি শুধু বই-ই। তোমার বিছানার আদ্ধেক জায়গাও নাকি বইয়ে ভরা?

সে রাখার জায়গা নেই বলে। গোছাবার লোক নেই বলেও কিছুটা। লেখাপড়া জানা একজন লোক রাখবার ইচ্ছে আছে। যে বইয়ের কদর বোঝে।

হুঁ। তা ভালো। সত্যিই যে কাজের লোক নিরক্ষর, তার কাছ থেকে বইয়ের যত্ন আশা করা যায় না।

গোছাতে বসলে উলটো করে রেখে দেয়। এমন এমন বেজায়গায় বই রাখে যে খুঁজতে গিয়েই একঘণ্টা সময় যায়।

চাঁদু বলল।

নিজেই ক্যাটালগিং করো না কেন? কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এলে তোমাকে দেখাবো। বাবারই তিরিশ হাজার বই ছিল। আইনের বই ছাড়া। সে সব বই বার-লাইব্রেরিকে দিয়ে দিয়েছি। তার উপরে আমিও হাজার দশেক যোগ করেছি। আমি লাইব্রেরিয়ানশিপ পরীক্ষাটা শুধু এই জন্যেই পাশ করেছিলাম, যাতে নিজেদের বাড়িব লাইব্রেরিটাকেই ভালো করে রাখতে পারি। শুধু ক্যাটালগিংই নয়, আমি সমস্ত বই নিজেই বাঁধাই করি। তার জন্যে যে সামান্য যন্ত্রপাতি দরকার তা কিনে নিয়েছি। জানো ভগা আমার সম্বন্ধে যা বলে, তা মিথ্যে নয়। ওর সঙ্গে আমাব তফাত আছে। ওর মতো ডাইনামিক ভার্সেটাইল, আনইউজুয়াল মানুষরাই যে কোনো সমাজের প্রাণস্পন্দনের প্রতীক। আই অ্যাম ভেরী ভেরী ভেরী প্রাউড অফ মাই ব্রাদার। ও আমাকে খুবই ভালোবাসে। তবে ওর ভালোবাসার বকমটা অদ্ভুত। প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসার রকমই আলাদা আলাদা হয়। যখন বিয়ে করবে, যদি কখনও করো, এই কথাটা মনে রেখো। আমরা প্রত্যেক মানুষই আলাদা আলাদা ইণ্ডিভিজুয়াল। অন্য ইন্ডিভিজুয়ালের ইন্ডিভিজুয়ালিটিকে যে মানুষ সম্মান করতে পারে না তার নিজের পক্ষেও সম্মানিত হওয়া দুরূহ। যে কেউই বাইরে থেকে দেখলে ভাববে ভগা আমার পরম শত্রু। আসলে ওর মতো ভালো হয়তো আমার স্ত্রীও আমাকে বাসেন না। সেটা চিত্রার দোষ নয়। ভালোবাসার ক্ষমতাও ভালোবাসা প্রকাশের রকমেরই মতো প্রত্যেক মানুষেরই আলাদা আলাদা।

বাঃ। চাঁদু বলল। ভাবল, কী চমৎকার করে কথা বলে পগাদা। এই মানুষটাকে কাছে থেকে না জানলে কত বড় একটা মিথ্যে ধারণা হয়ে থাকতো ওঁর সম্বন্ধে।

আপনি যে একটু আগে বললেন ভগাদা যা বলেন তা ঠিকই বলেন, তা কোন্ কথাটা ?

ঐ। বাবার পয়সায় বসে বসে খাই। বাবার পয়সায় জার্নাল বের করি। শিশুকাল থেকে সাহিত্যের প্রেমে পড়ে আমার অবস্থাটা কেমন হয়েছে জানো ?

কেমন ?

ব্যোদলেয়রের সেই কবিতার মতো। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা যেমন কবি, যাঁরা কবিতা পড়েন বা কবিতার প্রেমে পড়েন তাঁরাও কম কবি নন। আমার অবস্থা ওঁর "দ্যা অ্যালবাট্রস"-এর মতো।

"The poet is like thes monarch of the clouds,
Familior of storms, of stars and of all things;
Exiled on Erth amidst its hooting crowds,
He cannot walk, borne down by his Giant wings!"

চাঁদু চুপ করে রইল। ব্যোদলেয়রের এই কবিতা তার পড়া ছিল না। পগাদার এই আপাত অসামাজিকতা, এই বাকহীনতা, এই আপাত দম্ভ যে কত করুণ এক দুঃখবাহী তা যেন এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না চাঁদু।

কবিতা ও সাহিত্যকে ভালোবেসে আমি স্থবির, পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গেছি চাঁদু। আমাকে খুব কম মানুষই বোঝে। অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবে মিস আন্ডারস্টুড হবার চেয়ে বড় মিসফরচুনও তো মানুষের খুব বেশি নেই।

চাঁদু কথা বলল না এবারেও।

গ্লাসে আর এক চুমুক দিয়ে পগাদা বললেন, তুমি ব্যোদলেয়রের 'ফ্লাওয়ারস অফ ইভিল' (লে ফ্ল্যদ্যা মাল্) পড়েছো ?

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ পড়েছি। চাঁদু বলল।

তা ভালো। কিন্তু ইংরিজি অনুবাদে ঐ বইটির ভূমিকাটির অনুবাদ আছে। তিনটি ভাগে ভাগ করা। প্রিফেস ওয়ান, প্রিফেস টু আর প্রিফেস থ্রী। সম্ভব হলে, পড়ো। বড় বড় কবি সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাঁদের নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা তাঁদের নিজের নিজের কাজ সম্বন্ধে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও কিছুটা জানা থাকলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়। জানি না, কথাটা ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমার তাইই মনে হয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দাওনি এখনও।

কোন প্রশ্নের ?

চাঁদু শুধলো।

ঐ যে ! লিটারেচার আর জার্নালিজম্-এ, তফাত কোথায় ?

চাঁদু গলা খাঁকরে বলল, কথাটা আমার নিজের নয়। কিন্তু হচ্নারের লেখা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উপরে একটা বইতে পড়েছিলাম যে, একদিন এক ঘোড়ার মাঠে গেছেন হেমিংওয়ে, হচ্নারের সঙ্গে। রেস শেষ হয়ে গেছে। রেস্-এর পর দোতলার 'বার'-এ দুজনে বসে আছেন পানীয় নিয়ে। শেষ সূর্যের রশ্মি পড়েছে ঘোড়ার খুরে খুরে ওড়া ধুলোর মেঘে। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। হেমিংওয়ে হচনারকে বললেন, লুক্ হচ্ কী চমৎকার দেখাচ্ছে এই আসন্ন-সন্ধ্যার ছবিটি ! বড় সুন্দর ! তাই না ? কিন্তু জানো, "মিস্টার ডেগাস (শিল্পী ডেগাস) ক্যুড হ্যাভ পেইন্টেড ইট বেটার।" এই হচ্ছে জার্নালিজম্ আর লিটারেচারের মধ্যের তফাত।

মানে ?

পগাদা তীক্ষ্ণ চোখে চাঁদুর দিকে চেয়ে বললেন। কি বোঝাতে চাইছ তুমি ?

বোঝাতে চাইছি···চাঁদু বলল, বোঝাতে চাইছি যে নিছক রিয়্যালিজম্ বা স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস্ বা ফোটোগ্রাফি হয়ত শিল্প এবং সাহিত্য নয়। তার সঙ্গে শিল্পী বা লেখকের কল্পনা মিশিয়ে যদি সেই ফোটোগ্রাফ, বা ছবি বা সাহিত্যকর্মকে অন্য এক মাত্রা দান করা না যায় তবে তা প্রকৃত শিল্প বা সাহিত্য হয়ে ওঠে না।

বাঃ। সুন্দর বলেছো। যদিও আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। কিন্তু প্রায় একমত।

চাঁদু বলল, আপনি আপনার সঙ্গে আর ভগাদার সঙ্গে মূল তফাতটা কোথায় বলে মনে করেন ?

পগাদা পা দুটি নামিয়ে নিয়ে গ্লাসটাকে ডানদিকের হাতলের উপর রেখে হেসে উঠলেন। বললেন, ভেরী ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ইনডিড্। যদিও একটু এমবারাসিং।

একটু চুপ করে থেকে বললেন পগাদা, জানো চাঁদু, মার্টিন লুথার কিং বলতেন, ভালোবাসা তিন রকমের হয়।

প্রথম রকম হচ্ছে EROS অর্থাৎ The souls Yearning for the

divine, the aesthetic or romantic love.

দ্বিতীয় রকম ভালোবাসা হচ্ছে PHILIA অর্থাৎ Reciprocal love·

আব তৃতীয়রকম ভালোবাসা হচ্ছে AGAPE distinct love, not for one's good but for the good of one's own highbour, not weak or possitive, but love in action. এই পৃথিবী, সমসময়, আমার দেশ, আমার দেশবাসী, আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি আমার যা অনুভূতি, একে তুমি ভালোবাসা বা মমত্ববোধ বা দরদ যাইই বল না কেন তা ঐ "EROS" পর্যায়েরই। আর ভগা হচ্ছে সেই মুষ্টিমেয মানুষদের একজন, মার্টিন লুথার কিং-এরই মতো ; যার ভালোবাসা, সব মানুষেরই প্রতি ঐ "AGAPE"'র অন্তর্গত। ওকে দেশে ফিরে আসতেই হবে। আমাদের দেশেব শিবাজীরাওদের ওর মতো মুষ্টিমেয় মানুষই উদ্ধার করতে পাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে আমাব মতো সম্পাদকীয় দফতরে জ্বালাময়ী ভাষাতে চিঠি লিখেই যারা স্বদেশ, স্বজাতি এবং সমসময়ের প্রতি সব কর্তব্য কবলাম বলে মনে করি তাদের দিয়ে কিছুই হবে না। এই জন্যেই তোমাকে বলেছিলাম যে, ও আমার চেযে অনেক উঁচুস্তবেব মানুষ। ডঃ বাধাকৃষ্ণান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাতে বলেছিলেন . "সা অক্ষরো ভিপরিতাত্ত্বে রাক্ষসো ভবতি ধ্রুবম্ "He who is literate, when inverted becomes a demon" আমাদের মতো অনেক শিক্ষিতরাই হয়তো আসলে রাক্ষস। আরেক বক্তৃতাতে উনি বলেছিলেন, সম্ভবত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে : "Move than your intellectted ability or technical skill what makes you valuable to the societyis your devotion to a great cause." আমি নেহাতই একজন শিক্ষিত মানুষ। আমাব শিক্ষা হচ্ছে education of letters কিন্তু সমাজের কাছে দেশের কাছে অনেকই বেশি দামী ভগা।

আবার আমার কি নিন্দা করছিলি রে চঁদোর কাছে তুই পগা ?

দু হাতে জাগের উপর জিনের বোতল, একটা গ্লাস, গন্ধরাজ-লেবু, কাঁচালঙ্কা এবং এক বোতল জল নিয়ে এসে চাঁদুর পাশের চেয়ারে বসলেন ভগাদা। চান কবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছেন। দারুণ দেখাচ্ছে ভগাদাকে।

এমন সময় স্নিগ্ধা বারান্দায় এলো। সকালের শাড়ি ছেড়ে ও এখন একটি খয়েরি সাদা আর কালো ডুরে ধনেখালি শাড়ি পরেছে আর খয়েরি রঙা একটি ছোট হাতাব ব্লাউজ। গলায় খয়েরী রুদ্রাক্ষের মালা।

স্নিগ্ধা বলল, এই দাদারা ! বেশি খেও না কিন্তু । মা রাগ করছেন । খাবার নষ্ট হবে ।

পালা তো । তোদের অখাদ্য সব রান্না যাতে সুস্বাদু মনে হয় তাই একটু জিভ মেরামত করছি আর যত্ত ঝামেলা । শোন্ খাবার দেবার পনেরো মিনিট আগে একবার বলে যাবি ।

কেন ?

টক্ করে ঐ সময়ের মধ্যে একটা কুইক-ওয়ান্ মেরে দেবো । আমি তো হ্যান্ডিক্যাপে দৌড়চ্ছি ।

স্নিগ্ধা বলল চাঁদুর দিকে তাকিয়ে, আপনি তো ভালো ছেলে জানতাম । দাদাদের পাল্লায় পড়ে আবার···

"সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি ।" ভগাদা বললেন ।

সাতকোটি সে কবেকার কথা । [illegible]শা কোটিতে পৌঁছে গেছি আমরা প্রায় ।

আরে শিবাজীরাও কোথায় । আচ্ছা [illegible]গতো তো এ লোকটা ! আরে এ গির্‌ধারী । গির্‌ধারী ।

আহ্ । তুই বড্ড চেঁচামেচি করিস ভগা ।

তা কি করব ? অতিথি গেল কোথায় তুইও তো দেখতে পারতিস একটু ?

চেঁচামেচিতে বাজীরাও দারোয়ানদের ঘর থেকে বেরোল । গিরিধারীও বীয়ারের বোতল দুটো আর একটি গ্লাস নিয়ে বারান্দায় এল ।

ভগাদা বলল, আররে ! তুম তো অজীব অদমী হো । পিও । আভ্‌ভি খনা লাগ্ যায়েগা ।

বাজীরাও কাতরস্বরে অনুনয় করে বলল, ওগুলো দারোয়ানদের ঘরে নিয়ে গেলে ভালো হয় ।

কী চিত্তির ! আগে বলবি তো রে বাবা । দু'বোতল বীয়ারে ঐ মহাদেবের চেলাদের কি হবে ? এই ইমরান । কাঁহা চলে গ্যায়া তুম ?

ইমরান্ লিচু গাছের তলায় চৌপায়া বিছিয়ে শুয়েছিল । ভগাদা বললেন, যানে আনেমে কিতনা টাইম লাগে গা ?

আধা ঘণ্টা কম্‌সে কম্ ।

তো ঠিক হ্যায় । পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে বলল সাত-আট বুতল বীয়ার লাও. ঠাণ্ডা । একদম্ জল্‌দি সে জল্‌দি । ঔর হুয়াঁহি লেতে যানা ।

বলে, দারোয়ানদের ঘর দেখিয়ে দিল।

ইমরান তীরবেগে চলে যেতেই স্বগতোক্তি করলো ভগাদা,চাঁদুর অনারে আজ রান্নাঘরে যে সব কাণ্ডমাণ্ড হচ্ছে আরও এক ঘণ্টার আগে খাবার দেবার কোনো চান্সই নেই। তোর জন্যে আমার বউয়ের হাতে গরম তেল ছিট্‌কে ফোস্কা পড়ে গেছে। হতচ্ছাড়া একটা।

চাঁদু কিছু না বলে হাসলো।

ভিতবের বারান্দাতে শতরঞ্চি ভাঁজ করে লম্বা করে পেতে দেওয়া হয়েছিল। ওরা সবাই বসলো। বাজীরাও বলল, ও পরে দারোয়ান আর ইমরান্‌-এর সঙ্গে একসঙ্গে খেলে ভালো করে খেতে পারবে।

আসলে ওদের বীয়ারই তখনও শেষ হয়নি। মাল্‌তি বলল ও হেমমাসিদের সঙ্গে খাবে। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মেযেরা কেউই বসলেন না। চাঁদু আপত্তি করাতে হেমমাসিমা বললেন, দ্যাখো বাবা! আমি যতদিন আছি এই ট্রাডিশনই চলবে। মেয়েরা বৌয়েরা দাদাদের এবং স্বামীদের নিজে হাতে রান্না করে যত্ন করে খাওয়ালে মেয়েদের 'উইমেনস্‌ লিব্‌' বিঘ্নিত হয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মেয়ে বৌয়েরাও করে না।

আমরা বলেই ওদেব দিকে ফিরে বললেন, ঠিক তো রে?

তারপর বললেন সব কিছুই নির্ভর করে সম্পর্কের উপরে। ওরা তোমাদের নিজেরা পবিবেশন করে না-খাইয়ে যদি নিজেরা খেতে না চায় রবিবারে কী বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে, তবে আমি কি জোর করতে পারি? অন্যসময়ে তো একসঙ্গেই খায় টেব্‌লে বসে। আমিও খাই। আজকাল কি আর অত নিয়ম কানুন মানা সম্ভব?

কতুবকম যে রান্না হয়েছে! দই-কই, মুড়িঘণ্ট, মাছভাজা, মাছের টক। হেমমাসি মোড়া নিয়ে বারান্দাব থামে হেলান দিয়ে বসে তদারকি করছেন। পোলাউ রান্না হয়েছে। বাঙালী পোলাউ। মিষ্টি স্বাদের হলুদ-রঙা। হেমমাসি আঙুল দিয়ে এক একটা পাত্রের দিকে দেখিয়ে বলছেন, এইটি করেছে চিত্রা আর এইটি শুক্লা।

শুক্লা বললেন, আর বাকি সব মা। শুধু অন্য একটি পদ ছাড়া। সেটি করেছে স্নিগ্ধা। স্নিগ্ধা নিজেই পরিবেশন করবে। ক্রেডিটটা আর কাউকেই দিতে চায় না।

আহা! কপট রাগের সঙ্গে বলল স্নিগ্ধা।

কি ? পদটি কি ? বেশ সপ্রতিভতার সঙ্গে শুধলো চাঁদু । স্নিগ্ধা প্রসঙ্গে এতটা সপ্রতিভতা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলো । লজ্জিতও ।

কই মাছের হরগৌরী । এক দিক মিষ্টি আর অন্য দিক নোন্‌তা । স্নিগ্ধা হর-গৌরীর পাত্র নিয়ে বাঁ দিক থেকে আগে ভগাদা, পরে পগাদা, তারপরে চাঁদুর সামনে এসে হাঁটু জড়ো করে বসল । আজ চান করে চুল বাঁধেনি স্নিগ্ধা । ফিন্‌ফিনে কালো চুল কোমর ছাপিয়ে মাটিতে পড়েছে বলে নিচের দিকটা গিঁট দিয়ে রেখেছে ।

চটি খুলে রেখেছে সকলেই । খালি পা-দুটি জোড়া করে যখন চাঁদুর একেবারে কাছে এসে বসল স্নিগ্ধা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদু চেয়ে রইল তার পায়ের দিকে । কী সুন্দর গড়ন পায়ের ! শাড়ির খয়েরী পাড়ের তলায় লেস্‌-বসানো শায়ার নিচে গোড়ালির একটুখানি দেখা যাচ্ছে । ওর শরীরের পারফ্যুমের গন্ধ নানারকম রান্নার গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে । নেশা নেশা লাগছে চাঁদুর । হাতা করে তুলে যখন হর-গৌরী ওর পাতে দিল তখন লক্ষ করল চাঁদু ওর হাতের গড়ন কাছ থেকে । লতানো বাহু, কনুই থেকে কব্‌জি, হাতের পাতা যেন কোনো মহারাজার জন্যে স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলে কাস্টম বীল্ট্‌ করানো হয়েছে । শিল্পীর আঙুলের মতো আঙুলগুলি । সরু । টেপারড্‌ ।

স্নিগ্ধাকে হেমমাসি বললেন, কীরে মেয়ে ! আরেকটা দে । একটা খেলে ঝগড়া হয় ।

আর পারবো না ।

চাঁদু প্রতিবাদের গলায় বলে উঠল ।

"পারিব না এ কথাটি বলিও না আর একেবারে না পারিলে করো শতবার ।" হাসতে হাসতে বললেন হেমমাসি ।

এতো কষ্ট করে কাঠের আগুনে এই ঠাণ্ডাতেও ঘেমে নেয়ে রাঁধলাম আর খাবেন না বললেই হল ? আরেকটা খেতেই হবে ।

এবারে স্নিগ্ধা বলল ।

আরে ! আমি খেতে পারি না এতো !

আমিও দিতে পারি না এতো । বিশেষ দিন । বিশেষ অতিথি । তার ওপর মাতৃআজ্ঞা ! অতএব !

আসলে চাঁদুর ক্ষিদে-তৃষ্ণা সব লোপ পেয়ে যায় স্নিগ্ধাকে দেখলেই । গলা শুকিয়ে আসে । এমন অসুখ আর কোনোদিনও করেনি আগে । মুখ তুলে চাইতেই চোখে পড়লো খয়েরী ব্লাউজের মধ্যিখানে গ্রীষ্মদিনের, পূর্নবয়স্কা দুটি

ছটফটে তিতিরের মতো মুঠিভরা দুটি স্তনের সন্ধির আভাসে। সারা শরীর ওর শিরশির করে উঠল। অথচ ইংল্যান্ডে কত স্বল্প-বাস ইংরেজ মেয়ে দেখেছে পথে-ঘাটে, বন্ধুত্বও হয়েছে কত জনের সঙ্গে। কেন যে এমন ঘটছে। কখনওই··আগে··· চাঁদু চোখটা আর একটু উপরে তুলে দেখল স্নিগ্ধা অপলকে তার চোখে চেয়ে আছে। শুধুমাত্র চোখ দিয়ে যে এত কথা এমনভাবে বলা যায়, স্নিগ্ধাকে না দেখলে জানতো না চাঁদু। দুটি অভিব্যক্তিময় পাতলা ঠোঁটে ফ্রিজ করে গেছে একটি দুষ্টুমির হাসি।

মাসিমণি তাব কী সর্বনাশ যে করলেন তা মাসিমণি জানবেনও না কখনও, তাঁব এই বড ননদেব সেজ ননদ হেমনলিনী অ্যান্ড ফ্যামিলিকে তার কাছে পাঠিয়ে।

॥ সাত ॥

বাবা ও মা চলে যাবাব পর এমন আনন্দসন্ধ্যা চাঁদুর জীবনে আর আসেনি।

খাবার-দাবারের ঝামেলা বাড়িতে করেনি। গান-বাজনাটাই মুখ্য, খাওয়া-দাওযাটা গৌণ এমন সমাবেশে। তবু, অষ্টমীর দিন! হান্নানের দোকানে মাটন-বিবিয়ানি আব চিকেন-চাঁবেব অর্ডার দিয়ে বেখেছিলো। সময় মতো গাড়ি পাঠাবে। একেবারে গরম গরম নিয়ে আসবে সব। সঙ্গে গুলহার কাবাব। এবং শেষে বাবড়ি।

হেমমাসির জন্যে শুধু লুচি বেগুন ভাজা, ছানার ডালনা, আর ধোঁকার ডালনা কবতে বলেছে সুরজকে। বলেছে, খাওয়ার ঠিক আগে আগেই লুচি, গরম গরম ভেজে দেবে। ব্যানার্জীদাব বাড়ি থেকে ধার করে এনেছে ডিনার-প্লেট আর গ্লাস। ক্লাবেব দুজন বেয়ারাকেও তুলে নিয়ে আসবে গাড়ি। খাবার সার্ভ করার জন্যে। ড্রিঙ্কস ছেলেদের, আর সফট ড্রিঙ্কস মেয়েদের সুরজই দেবে। বুফের জন্যে খাবার ঘবে টেবলও সাজিয়েছে। ক্লাবের মালীকে বলে বিকেলেই ফুল আনিয়ে নিজে হাতে ফুল সাজিয়েছে চাঁদু। ফুল সাজাতে ও খুব ভালোবাসে।

বসবার ঘব থেকে সব ফার্নিচার পেছনের বারান্দায় সরিয়ে দিয়েছে একমাত্র রাইটিং-ব্যুরোটি ছাড়া। দিয়ে, কলকাতা থেকে নিয়ে-আসা কাশ্মীরী বড় গালচেটা পেতেছে। মা শ্রীনগর থেকে কিনেছিলেন কুড়ি বছর আগে।

তানপুরাতে বসেছে হেমেন। তবলাতে গিরিশ সিং। এস্রাজে কামতাপ্রসাদ।

সকলেই ব্যাচেলরের রুচি এবং ঘব সাজানো দেখে বাঃ বাঃ করেছেন।

শুক্লা বললেন, ঠুংরীর আসর বসার আগে গৃহস্বামীর বাংলা গানটা হয়ে যাক।

সেই নিধুবাবুর গানটা কিন্তু আজ না-শুনে ছাড়ছি না। কল্যাণদা, ব্যানার্জীদা এবং ওঁর স্ত্রী মহুয়া বৌদি, অনিমেষবাবু এবং তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর শালা সমরেশও এসেছে। ছেলেরা, যাঁরা হুইস্কি খান, তাঁদের হুইস্কি দিয়েছে সুরজ। গ্লেনফিডিশ। চারবাড়ির ফ্রিজ থেকে বরফও জোগাড় করেছে চাঁদু। নিজের ফ্রিজ ছাড়াও।

প্রথমে সমরেশই গাইলো দু'খানি আগমনী গান। যদিও আজ অষ্টমী তবু সমরেশের একটি গান, নবমীর গান, সবাইকে মুগ্ধ করলো।

"নবমীর নিশিগো তুমি আর যেন পোহাও না
দুখিনী মায়ের প্রাণে আব ব্যথা দিও না।
সপ্তমী আর অষ্টমীতে ছিলেম সুখে দিনে রাতে
নবমীর নিশি পোহাইলে উমা ঘরে রবে না।"

ঐ গানটিব পরে সকলেই ধবলেন চাঁদুকে নিধুবাবুর ঐ গানটি গাওয়ার জন্যে। গাওয়ার আগে চাঁদু নিজেই বলল, একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছি আগে। যদি আপত্তি না থাকে।

ইতিমধ্যেই ভগাদার পেড়াপিড়িতে দুটি হুইস্কি খেয়েছিলো চাঁদু। হুইস্কি খেলেই, লোকে না বললেও ওর গাইতে ইচ্ছে করে।

ধরলো চাঁদু।

"ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি/ রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি/ তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ, মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্যভাতি/ তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলেব ডালা— আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যুথী জাতি/ তব পদতললীলা, আমি বাজাব স্বর্ণবীণা— বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানসসাথী।"

ভগাদা বললেন দারুণ গাস তো তুই! তবে এ গান তো মেয়েদের গাইবার।

বোকার মতো চাঁদু বললো, কেউ তো গাইলেন না। তাই··।

এতে সকলেই হেসে উঠলেন।

স্নিগ্ধার চোখের দিকে এক পলক চোখ রেখেই চোখ নামিয়ে নিলো ও।

পগাদা বললেন, রবীন্দ্রনাথ যে কত পুরুষ আর নারীদের পার্সোনাল এমবারাসমেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন তার মূল্যায়ন এখনও পুরোপুরি করা হয়নি। কী বল্ ভগা : যে-কথা সামনাসামনি অন্যকে বলা যায় না, সেই কথাই কত সহজে ওঁর গানের মাধ্যমে বলা যায়। কী বলো বিন্দিয়া? স্নিগ্ধা কী বলিস?

স্নিগ্ধা বললো, তা ঠিক। বিশেষ করে যাঁদের সাহসের বা আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান মস্ত বড় অবলম্বন!

চাঁদুর মুখ লাল হযে উঠলো।

স্নিগ্ধা উপভোগ করলো ওর 'ব্লাশ' করাটা। মনে মনে খুশি হলো তীর লক্ষ্যভেদ কবেছে বলে।

চাঁদু ভাবলো, এরকম নিষ্ঠুর কোনো মেয়ে হতে পারে তা ওর আগে জানা ছিল না।

শুক্লা বললেন, আমার অনুরোধের গানটা কিন্তু কেবলি পোস্টপন্‌ড হয়ে যাচ্ছে। ঐ গানটা কি হলো?

চাঁদু বললো, নিধুবাবু, মানে রামনিধি গুপ্ত থাকতেন হাওড়াতে। ওই গল্প আমার চণ্ডীদাস মাল মশাই এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায়েরই মুখে শোনা। দুজনেই নিধুবাবুর শিষ্য কালীপদ পাঠকের কাছে গান শিখেছিলেন।

আর রাজ্যেশ্বর মিত্র এবং গোপাল চট্টোপাধ্যায়? তাঁরা বুঝি শেখেননি? পগাদা বললেন।

নিশ্চযই। তাঁরাও শিখেছিলেন। ওঁবা সকলেই নমস্য ব্যক্তি। এই গল্প বোধহয় তুমিও জানো সমরেশ।

সমরেশ মাথা নাড়িয়ে বললো হ্যাঁ! জানি। তবে আপনিই বলুন। আপনার মতো আমি গুছিয়ে বলতে পারবো না।

তা গঙ্গার তীরে ফেরী লঞ্চের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন নিধুবাবু এক শেষ বিকেলে। সামনেই মেয়েদের চানের ঘাট। শিল্পী মানুষ। আত্মভোলা। অত খেয়াল করেননি। মেয়েরা বলে উঠলো: কী অসভ্য পুরুষ মানুষ গা! চান দেখছে আমাদেব দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে! কথাটাতে নিধুবাবু লজ্জা পেলেন খুবই। দুঃখও পেলেন তার চেয়েও বেশি। বাড়ি পৌঁছেই গান বাঁধলেন একটি। ঝিঁঝিটে। সেই গানের বাণীটি আগে বলে নিই। তার পরে সমরেশ গাইবে।

সমরেশ বলে উঠলো, না দাদা। আপনার গান শোনার পর আমার এ আসরে আর গাইবার হিম্মত হবে না। আমি এবার শুনব শুধু।

বাঃ তা কেন?

তাইই!

সমরেশ বললো।

চাঁদু গানের বাণীটি বললো:

"মনেরে বুঝায়ে বলো,

নয়নেরে দোষো কেন ?
(ওগো) আঁখি কি মজাতে পারে
না হলে, মন-মিলন ?
মনেরে বুঝায়ে বল···
আঁখিতে যে যত হেরে
সকলই কি মনে ধরে ?
পোড়া মন যাকে মনে করে
ওগো সেই হয় তার মনোরঞ্জন··· ।
মনেরে বুঝায়ে বল··
বলেই, গানটি ধরে দিল ।

কামতা-প্রসাদের এস্রাজ কেঁদে উঠলো । তানপুরার অনুরণনে হেমেন আগেই ঘর ভরিয়ে দিয়েছিলো ফুলের, মহিলাদের নতুন শাড়ির আর পারফ্যুমের গন্ধের সঙ্গে । গান যখন শেষ হলো সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন । শুধু স্নিগ্ধা কিছু বললো না । মুখ নিচু করে রইলো । ওর আনত মুখখানিকে কালো চুলের মধ্যে সাদা সিঁথি, কমলা-রঙা বালুচরী শাড়ি আর ব্লাউজের সঙ্গে এলো-খোঁপায় গোঁজা অগ্নিশিখা ফুল অগ্নিশিখারই মতো দেদীপ্যমান করে রেখেছিলো ।

চাঁদুর অজান্তেই একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো । কাউকে ভালো লাগা যে এতো কষ্টকর অভিজ্ঞতা সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিলো না ওর । এতো আলো, এতো ফুল, এতো সুগন্ধ, এত খুশির মধ্যে নিজেকে বড় দুঃখী বলে মনে হলো । ও বুঝলো, প্রেমে পড়ার মতো কষ্ট আর নেই । মৃত্যুর সময়ের কষ্টও বোধহয় এতো তীব্র নয় ।

ওকে সকলেই আরো গাইতে অনুরোধ করলেন । কিন্তু ও বললো, আমার কুটিরে অনুষ্ঠান । এটা আদপের মধ্যে পড়ে না । আজ মেহমানবাই গাইবেন । আমি আর একটাও নয় ।

বলেই বললো, এসো বিন্দিয়া । আগে লোকাল ট্যালেন্টরা । তারপর কলকাতার আর্টিস্টদের গান শুনবো আমরা অনেকক্ষণ ধরে ।

সকলের অনুরোধে বিন্দিয়া হারমনিয়মে এসে বসলো ।

চাঁদু নিজে হারমনিয়ম বাজিয়ে গায় না । বাজনা খুব বেশি হলে গান চাপা পড়ে যায় । রামকুমারবাবু একবার বলেছিলেন, চাঁদুর বাবাকে, "বুঝলে অনির্বাণ ! আমাদের সময়ে আমরা বলতুম গান-বাজনা । এখন ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে বাজনা-গান । বাজনাটাই আসল । গানটা সেকেণ্ডারি ।"

কথাটা মনে খুব ধরেছিলো চাঁদুর। গলা যদি ভালো হয়, সুরে বলে ; তবে বেশি বাজনা নিয়ে গলার দুর্বলতা ঢাকার দরকার হয় না। তবে হারমনিয়ম, তবলা, এস্রাজ এবং তানপুরাকে কোনোমতেই বাজনার আধিক্য বলা যায় না। তাছাড়া তানপুরাকে সেই অর্থে বাজনা বলাও যায় না।

এই সমাবেশে ভালো হারমনিয়ম বাজিয়ে তেমন কেউ আছেন কী না জানে না চাঁদু। খুব ভালো বাজিয়ে না হলে টপ্পার সঙ্গে বাজানো সহজ নয়।

বিন্দিয়া, তবলচি গিবিশ ভাইয়াকে বললো, দাদা সুধাবখানি তালে গাইব। জানেন তো ?

মাথা নাড়লো গিরিশ। গিরিশ ভাইয়া একসময় বানাবসেব নামী নামী আসবে বাজিয়েছেন। তাল-লয় গুলে খেযেছেন। লাল্লান পিয়া ঠুম্‌রীতে 'সম্' যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তা বাঘা-বাঘা তবলচিও আঁচ না করতে পেরে বোকা বনে যান। কিন্তু গিরিশ ভাইয়াকে বোকা বানাতে আজ অবধি কেউ পারেনি। সব রকম পাহাড়ী ঠুমরীরই হাল-হকীকৎ তাব জানা। সনদ-পিয়া, কাদর-পিয়া, এবং সুঘর-পিয়া। অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের বিখ্যাত বই "স্মৃতিব অতলে"তে যে ভাইয়া গনপৎ রাও সাহেবের উল্লেখ আছে এই 'সুঘর-পিয়া' ঠুংবী তাঁরই ঘরাণার। সব রকম ঠুম্‌রীর সঙ্গেই গিরিশ ভাইযার বাজানোব অভ্যাস ছিলো। অথচ এখন উনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক। পেট বড়ই নিষ্ঠুব।

শিল্প এবং শিল্পীর দাম আজ আর কে দেয়। রাজন্যবর্গরা তাও কদব করতেন। আজকালকার নয়া-রাজন্যবর্গ, ইনড্রাসটিয়ালিস্ট আর ব্যবসাদাবদের বেশির ভাগেরই আর সবই আছে, শুধু সংস্কৃতি ছাড়া।

আজকাল তবলাতে হাতই দেবার অবকাশ গিরিশ-ভাইয়া পান না। বড় বড় লেজারে হিসেব লেখেন এখন। পার্সোনাল লেজারের চার্জ-এ আছেন। ভাগ্যিস বি-কমটা পাশ করেছিলেন। নইলে হয়তো না-খেয়েই মাবা যেতেন এতদিনে।

বিন্দিয়া গানের মুখটি একবার বাজালো। গিরিশ ভাইয়া তবলাতে ও বাঁয়াতে পাউডার মাখিয়ে বেঁধে নিলেন বিন্দিয়ার স্কেলের সঙ্গে। বিন্দিয়া বললো, বাগ সোহনি। বলেই, আরম্ভ করলো·

গিরিশ ভাইয়া বললেন, রাত তো গভীর হয়নি বহিন। এখন শেষ রাতের রাগ কেন ?

বিন্দিয়া একটুখন মুখ নিচু করে রইলো। তারপরই নিচু স্বরে বললো, বড়ে ভাইয়া, আমার রাত তো শেষই !

মুখটি কালো হয়ে গেল সুন্দরী বিন্দিয়ার।

চাঁদুর বুকে বড় বাজলো কথাটা। ওর আর ভরতের কথা সকলেই জানেন। গিরিশ-ভাইয়াও মুখ নামিয়ে নিলেন।

আরম্ভ করলো বিন্দিয়া। ওর গলায় কান্না ঝরে। গান যদি প্রাণের বাণী বহন না করে তবে গানের বাণী মিথ্যেই হয়ে যায় বোধহয়।

চাঁদু ভাবছিলো।

"বাঁশীয়া না বোলে

ঔর সুমধুর রাধা নাম।

যব্ ছোড়্ চলে শ্যাম ব্রজধাম...

ব্রিজ নরনারীনে আঁসু বহাই

বিরহা কি তাপ্সে চিত্ মুরছাই।"

বিন্দিয়া বড় মুন্সিয়ানার সঙ্গে শুদ্ধ মধ্যম লাগিয়ে দিলো। তার সপ্তকেব ষড়জের বিশেষ প্রয়োগে রাগে যেন হঠাৎ আবির লাগলো। সোহিনি রাগেব মজাই এই। আরোহের ঋষভটি দুব্লা। এর চাল তার-সপ্তকেই যেন ঝল্সে ওঠে।

গান যখন গাইছিলো বিন্দিযা তখন চাঁদুর মনে হচ্ছিলো যে এ শ্যাম বৃন্দাবনের শ্যাম নয়। আসলে সে ভরতই। আর ব্রজধাম হচ্ছে এই রানীওয়াড়া টাউনশিপ্। প্রেম, বদলে ফিরে পায়নি এখনও চাঁদু। পেয়েছে কি ? জানে না। একতরফা প্রেমে পড়েই প্রেমের কষ্টের ভয়াবহতার আঁচ পেযেছে ও। আব যে দেওয়া-প্রেম ফিরে পেয়েছে জীবনে যাকে-দেওয়া, তার কাছ থেকে ; তাব দুঃখের গভীরতা যে কত্ত তা আজই প্রথম বুঝলো যেন ও।

হেমমাসি এগিয়ে এসে বিন্দিয়ার চিবুক ছুঁয়ে আদর করলেন। বিন্দিয়া হেমমাসির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

শিল্পের জগতে, বিশেষ কবে সঙ্গীত-জগতে এখনও কিছু সহবত ও বিনয অবশিষ্ট আছে যা শিল্পের অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই থাকলে বড় সুখের হতো।

ভাবছিলো, চাঁদু।

হেমমাসি বললেন, বাবা চাঁদু, তুমি সবই বন্দোবস্ত করেছো কিন্তু আমার আর শুক্লার পান কোথায় ?

কামতাপ্রসাদ হেসে বললেন, পানকা কম্মী ক্যা মউসীজী? বলেই, তাঁর বিরাট পানেব বাটা বের করে ওঁদের ভেজা ন্যাকড়া-জড়ানো পান বের করে দিলেন। রুপোর জর্দার কৌটো বের করে, জর্দাও।

বললেন, বানারস্কি মশহুব।

হেমমাসি ও শুক্লা পান নিলেন। চাঁদুও নিলো। তারপর জর্দা ফেললো মুখে. ঘাড় পেছনে কাত করে।

স্নিগ্ধার চোখে বিরক্তি ফুটে উঠলো।

চাঁদু শাদী-শুদা লোকেদের নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করে এসেছে এতোদিন। আজ যেন বুঝতে পারলো দুজন মানুষকে এক হতে হলে তাদেব দুজনেরই অনেক কিছু ছাড়তে হয় অন্যের ভালোলাগা বা পছন্দ-অপছন্দেব কারণে। ঠাট্টা কবাটা অনুচিত হয়েছে বোধহয়।

বিন্দিয়া মুখ নিচু করেই হারমনিয়মে মুখটি বাজালো দ্বিতীয় গানের। কামতাপ্রসাদ ভাইযার পান ও জর্দা মুখে দেওয়া হলো কী না দেখে নিলো বিন্দিয়া। তারপরই তবলাতে-বসা গিরিশ ভাইয়া বললো, বড়ে ভাইয়া, অব পাহাড়ী রাগ্‌মে গাউঙ্গি। ঔর তাল, লাওনি।

মুখভর্তি পান-জর্দা নিয়ে কথা বলতে না পেরে কামতাপ্রসাদজী মাথা নেড়ে খুশি জানালেন। গিরিশ ভাইয়া বললেন, বহত্‌ আচ্ছা! গাও বহিন্‌।

মুখটা ধরলো বিন্দিয়া।

"মেরে লাগিবে মনোযামে চোট্‌...

বিলাওল ঠাটেব এই রাগটি বড়ই প্রিয় চাঁদুর। মধ্যম ও নিষাদ স্বরদুটি এই রাগে অতি দুর্বল বলে ভূপালী প্রায়শই ছায়া ফেলে যায়। এই ছায়া সরাবার জন্যে সামান্য মধ্যম লাগানো হয়ে থাকে।

বিন্দিয়া গাইছিলো :

"মেরে লাগিরে মনোয়ামে চোট
য্যায়মন বসে তুম পাহাড়িয়া সাঁইয়া কি ওট্‌।
মেরে লাগিরে মনোয়ামে চোট...
মনোহব লিনু দরশ না দিনু
মেরে সাঁইয়া কি মনোয়া মে খোট্‌ ॥
মেরে লাগিরে মনোয়ামে চোট্‌ ...

আহা! কী গান! অন্তরাতে যখন নামলো বিন্দিয়া তার "মনোয়ামে চোট" যেন খোলা দরজা দিয়ে বাইরের ফিকে জ্যোৎস্না-ভরা শারদ রাতের শালজঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে গেলো।

গানের মতো আনন্দ আর নেই। গানের মতো দুঃখও আর নেই। ভালো সাহিত্যের মতো, ভালো গানের মতো দুঃখহারী সুখহারী বন্ধুও অন্য কিছুই নেই।

এক মিশ্র সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে গেলো চাঁদু। অন্য সব শ্রোতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলো। প্রত্যেকের আত্মার যেন বড় কাছাকাছি চলে এলো বিন্দিয়ার গানেরই মধ্যে দিয়ে এই মুহূর্তে। বিন্দিয়ার গান শেষ হলো। গানের রেশ যতক্ষণ রইলো ততক্ষণ কেউই কথা বললেন না। এখানে বেরসিক কেউ নেই।

তারপরই ভগাদা অ্যানাউন্স করলেন। এবারে আমার বৌ গাইবে।

শুক্লা বললেন, এমন নির্লজ্জ লোক দেখিনি।

নির্লজ্জ মানে ? ক্লাসিক্যাল গান জানো বলেই তো বিয়ে করলাম তোমাকে। নইলে তো কত রাজকন্যাই মালা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমার বৌ দারুণ গায় বুঝলি চাঁদু। শুধু দোষের মধ্যে, নিমীলক।

সমরেশ বললো, নিমীলক মানে ?

নিমীলক মানে জানো না ? নিমীলক হচ্ছে যিনি চোখ বুঁজে গান করেন। আমার স্মৃতিশক্তি, পগার মতো ভালো নয়। পগা এখুনি একজন গায়কের কী কী দোষের কথা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর বইয়ে আছে এবং গুণের কথাও, তা মুখস্ত বলে দিতে পারে।

গিরিশ ভাইয়া বললেন, আমাদের একটু বলুন পগা ভাইয়া। অত শাস্ত্র-টাস্ত্রের কথা আমরা তো জানি না।

পগাদা বললেন, এই ভগাব দোষ। গান হচ্ছে, কোথায় সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গানকে উপভোগ করবে, ভরে নেবে হৃদয়ের কানায় কানায়, গানের রসগ্রহণ করবে, না তার মধ্যে নিয়ে এলো নীরস শাস্ত্রের কথা !

চাঁদু বললো, তবু বলুন না পগাদা। আমিও জানি না। তাছাড়া গানের শাস্ত্র নীরস হবে কেন ?

পগাদা বললেন সব বলতে বসলে আজকের আসরই মাটি হবে। গায়কের গুণ হিসেবে সঙ্গীত-রত্নাকরে পনেরো রকম গুণের উল্লেখ আছে। আর দোষের মধ্যে চব্বিশ রকমের। আমি দোষ ও গুণ পাঁচটি পাঁচটি করে শুধু বলছি। তারপর গানে ফিরে চলো। এখানে সঙ্গীত-শাস্ত্র আলোচনা করতে আসিনি আমরা। গান শুনতেই এসেছি।

পাঁচটা করেই বলুন পগাদা। সমরেশ বললো।

দোষের মধ্যে নিমীলক ; ভগা যা বললো ; যিনি চোখ বুঁজে গান করেন। বিকল ; যিনি বেসুরো গান অর্থাৎ যাঁর গলায় সুর লাগে না। কাকী : যাঁর গলার স্বর কাকের মতো কর্কশ। উদ্ঘড় : যিনি মুখ বিকৃত করে গান করেন। আর

পাঁচটিব মধ্যে শেষটি হচ্ছে প্রসারী : তিনি প্রবল ভাবে হাত-পা নেড়ে গান করেন।

চব্বিশটিব মধ্যে মাত্র পাঁচটি বললেন ?

হ্যাঁ।

আর গুণ ?

হ্যাঁ। গুণও উল্লিখিত পনেরোটির মধ্যে শুধু পাঁচটি বলছি। জিতশ্রম : গান গাইবার সময় যাঁকে পরিশ্রান্ত দেখায় না। সুশাবীর : যিনি অভ্যাস ব্যতীত রাগরূপ প্রকাশ করতে সক্ষম, যেমন ছিলেন মৈজুদ্দিন খাঁ সাহেব। অনেকে বলতেন তিনি সরগম্ পর্যন্ত জানতেন না, অভ্যাস করা তো দূরস্থান ! ভগবানদত্ত ব্যাপাব ছিলো মৈজুদ্দিনের মধ্যে তা আপনারা সকলেই জানেন। অজস্রলয় যিনি বিভিন্ন লয়ে পারদর্শী। স্ফূর্জনির্জবন : নির্জবন আলাপে যিনি দক্ষ।

নির্জবনটা, কি ব্যাপার ?

কামতাপ্রসাদ শুধোলেন।

নির্জবন একটি প্রাচীন আলাপের রকম। কটা বললাম ? পাঁচটা হয়ে গেল ?

আরো দুটো বাকি।

সমরেশ বললো।

দুটো ? তাহলে, হৃদ্যশব্দ : যে গায়কের কণ্ঠস্বর সুমধুর এবং সুবেলা। যেমন আমাদেব বিন্দিয়াব।

আমি কি তাহলে কাকী ?

চাঁদু বললো।

সকলে হেসে ফেললেন ওর কথায়। স্নিগ্ধাও।

হেমমাসি বললেন, না বাবা, তুমি হচ্ছ হৃদ্যশব্দ।

আরও একটি বাকি আছে পাঁচটির। তালজুত : বিভিন্ন প্রকার তালে যিনি পারদর্শী।

কামতাপ্রসাদ বললেন আরে চাঁদু ভাইযা। এমন সব ছুপা-শ্রোতাদের মধ্যে আনপড় আমাদের ডেকে আনা তোমার উচিত হয়নি আদৌ।

পগাদা দু কানে দু হাত ঠেকিয়ে বললেন, অমন করে বললে উঠেই চলে যেতে হয় আপনার মতো বাজিয়ের এস্রাজের ধ্বনি থেকে বঞ্চিত হয়েই।

ভগাদা বললেন তা যা বলেছেন কামতাপ্রসাদজী ! আমাব বড়ে ভাই সত্যিই ছুপা-রুস্তম্। সারাটা জীবন ও খালি পড়াশুনোই করে গেলো। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। গয়ার ফল্গু। ধূ-ধূ বালি। একটু খোঁচা দিলেই

স্নানের জল বেরোয় হুড় হুড় করে।
অনেক হয়েছে। তোর গালাগালিতেই অভ্যস্ত আছি। তুই প্রশংসা করলেই আমার ভয় করে। এর পর কি করবি, তা ভেবে।
সকলেই হেসে উঠলেন।
চাঁদু সুরজকে ডেকে বললো, আরে সুরজ গ্লাস সব খালি পডা হুয়া হ্যায, হুইস্কি লাও। বোল্‌না কাহে পড়তা ? দিখ্‌তে চলো হরওয়াক্ত।
সুরজ খালি গ্লাসগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেলো।
চাঁদু বললো, গিরিশ ভাইয়া কি গ্লাসমে বরফ্ মত্ ডালনা : বলেই, শুক্লাকে বললো, এবারে এগিয়ে আসুন।
শুক্লা ভগাদার দিকে রাগের চোখে তাকিয়ে উঠে এলেন। তারপর বসলেন হারমনিযমে।
ক্যা গানা হ্যায় বহিন্‌জী ? আপকি ?
গিরিশ-ভাইয়া শুধোলেন।
শুক্লা বললেন বিন্দিয়া সুন্দর ঠুমরী গেয়ে ঠুমরীর সুরে ভরপুর পরিবেশই যখন তৈরি করে দিলো তখন এখানে খেয়াল বা ধ্রুপদ গেয়ে সেই পরিবেশ খামোখা গম্ভীর করতে চাই না আমি। বড ভালো লাগলো বিন্দিয়া। তোমার গান বহিন।
বিন্দিয়া দু হাত উঠিযে নমস্কার করলো শুক্লাকে।
তব ইজাজৎ দিজিয়ে।
বলে, অনুমতি চাইলেন শুক্লা সকলের কাছে। চুলবুল্লেওয়ালী মালকাজান বাইজীর ঘরানার একজনের কাছে দিল্লির মেয়ে শুক্লা গান শিখতো।
পগাদা বললেন।
হ্যাঁ ? অ্যাইসী বাত্ ! ঔর ভাবীজী ইতনি দেডতক্ চুপচাপ বৈঠি রহী থী ?
বিন্দিয়া বললো, কপট ক্রোধের সঙ্গে।
কল্যাণদা বললেন ভগাদা বেরসিক একথা পরম বেরসিকেও কখনও বলবে না। এ আপনার ওঁর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশেরই একটি রকম আর কী!
শুক্লা হেসে বললেন, যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ! বেরসিক ! গান-টান ভুলতেই বসেছি। তারপর শুক্লা বললেন, আমি দাদরাতে গাইছি। নেহাত সাদা-মাঠা তাল।
গাও বহিন্, গাও। কওনসি রাগ পেশ্ কর রহি হ্যায় বহিনজী ?
মিশ্র-গারা।

ওয়াহ্ ! ওয়াহ্ ! হামারা মন-পসন্দ্ কি রাগ । সাম্‌কো দো-পহর মে গানেকা রাগ । উম্‌দা । শুরু কিজিয়ে ।

শুক্লা যখন প্রথম লাইনটি ধরলেন তখন চাঁদুর মনে হলো শুক্লা বাঙালী মেয়ে নন । এমন উচ্চারণ, প্রতিটি লব্ধ-এর এরকম উঠাও, স্বরের মধ্যে এমন আচ্ছন্নতা একেবারেই চমকে গেলো চাঁদু । মনে হলো ভগাদার শুক্লা নন কোনো চারপুরুষের বাইজীই বুঝি ঠুম্‌রী ধরলেন ।

"পনিয়া ভরারী···

গোটা ঘর সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠলো । কে বলবে যে এই বাঙালী বৌই দই-রুই রান্না করে কোমরে-আঁচল জড়িয়ে পরিবেশন করে খাইয়েছিলো দুপুরবেলায় চাঁদুকে ।

"পনিয়া ভরারী
আল্‌বেলেঁ কিনার ঝমাঝম্ ।
হাত্‌মে রসিয়া কান্ধে গগরীয়া
হারে ভালে চমকে বিন্দিয়ারে ॥

"বিন্দিয়া" শব্দটি উচ্চারণ করার সময় চকিতে একবাব বিন্দিয়ার দিকে চাইলেনও শুক্লা । সুরমোহিত বিন্দিয়া তারিফের মাথা নাড়ালো ।

তারপর ধীরে ধীরে শুক্লা বিস্তার করতে লাগলেন । যেমন করে পরমা সুন্দরী যুবতী, যৌবনের দূতী, অনাবৃত করেন নিজেকে অথবা আবৃত ; যেমন করে শ্রাবণের নীলচে-কালো মেঘপুঞ্জ পরতে পরতে শালবনের মাথার উপরের আকাশে সাজাতে থাকে বর্ষণের ঘনঘোর ডালি, ঠিক তেমনি করে ।

আহা ! মোহিত হয়ে গেলো চাঁদু । মিশ্র-গারার বাদীস্বর গান্ধার আব সম্বাদীস্বর নিষাদ । বিশেষ করে পঞ্চম একেবারেই বর্জিত হওয়াতে এর একটি আলাদা চেহারা ফুটে ওঠে । আরোহে শুধু ঋষভ স্ববটিই বর্জিত হয় । শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিলো চাঁদুর ।

গান শেষ হলে সমস্ত ঘর কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলো । সবচেয়ে আগে কামতাপ্রসাদ বললেন, জী ভর্ গ্যয়া ভাবীজী । ঔর ইক্‌ঠো ।

শুক্লা এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন । বললেন, মাফি মাঙ্গ রহা হুঁ । মেরী আদত্ ইকদম্‌ই ছুট্ গ্যয়ী । ঔর না শুনানা শুকংগী ।

গিরিশ ভাইয়া বললেন, আদত্ ছুট যানেকি বাদ্‌হি অ্যায়সী গানা আপনে গাতি

তো যব্ আদত থী তব কৈসে গাতি থী রাম-ভগোয়ান্ই জানতা হোগা।

কারো কোনো অনুরোধ-উপরোধ শুনলেন না শুক্লা। আর কিছুতেই গাইলেন না।

এমন সময় খোলা দরজার সামনে ইমরান্ এসে দাঁড়ালো। বললো, সাব ইগারা বাজ গ্যয়ী। হাম্নকা দুকান তো বন্ধ হো যায়গা।

এগারোটা বেজে গেলো ? দেওয়াল ঘড়ির দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকালো চাঁদু। সত্যিই তো এগারোটা !

বিন্দিয়া বললো, ইগারা বাজ গ্যায়া ? আভ্ভি ম্যায় চালুঙ্গী।

সে কী ! এক্ষুনি খাবার এসে যাবে।

চাঁদু অপরাধীর গলায় বললো।

বিন্দিয়া বললো, আজ আমরা নিরামিষ খাই। তাছাড়া মা বাবা বসে থাকবেন না-খেয়ে আমি ফিরে না-যাওয়া অবধি।

হঠাৎই ভগাদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি বিন্দিয়াকে ছেড়ে দিয়ে আসছি। খাবারও তুলে আনবো দোকান থেকে। ক্লাব থেকে বেয়ারাদেরও। ইমরান সব চেনে।

কেউ বাধা দেবার বা কিছু বলবার আগেই,চলো বহিন, বলে বিন্দিযাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভগাদা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন চাঁদুকে, তোরা গান-বাজনা চালা। আমি এলাম বলে !

চাঁদু প্রমাদ গুনলো। কালই হয়তো ভগাদা বলবেন, কী কোমর মাইবি মেয়েটার ! কী বুক ! কোথায় লাগে মীর্জাপুরের মুন্নীজান !

সত্যিই নার্ভাস হয়ে পড়লো চাঁদু বিন্দিযাকে পৌঁছে দেবার জন্যে ভগাদার এমন আচমকা প্রস্থানে।

এবারে স্নিগ্ধার পালা। সকলেই ধরলো ওকে। বললো, একটা গান তো না-গাইলেই নয়। আপত্তি সত্ত্বেও স্নিগ্ধা উঠে এলো। বসলো হারমনিয়মের সামনে।

বললো, আমি গাইয়ে নই আদৌ। একটিমাত্র গান গাইবো। রবীন্দ্রসঙ্গীত।

অনিমেষদা বললেন, ভালোই তো। রবীন্দ্রসঙ্গীত কি গানের মধ্যে পড়ে না ?

প্রথম কলিটি একবার বাজিয়ে গেলো স্নিগ্ধা। কোন গান তা ধরতে পারলো না চাঁদু।

তারপরই স্নিগ্ধা শুরু করলো ; এমন করে শুরু করলো যেন এলে-বেলে কোনো খেলা খেলছে। কিন্তু প্রতিটি কথার ফুল সুরের জরির ঝালরে ফুটতে

ফুটতে সুগন্ধি অনাঘ্রাত এক নাম-না-জ্ঞানা ফুলেরই মালা তৈরি হয়ে এলো। দুলতে লাগলো চাঁদুর চোখের সামনে। না-শোনা গান। চাঁদুর না-শোনা। অন্যদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো শুনেছিলেন। জানে না চাঁদু।

স্নিগ্ধা গাইলো :

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকবো নাকো—
এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে।
দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুনব বাণী
না হয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে ॥"

গান গাওয়া শেষ হলে হারমনিয়মটি ঠেলে পাশে সরিয়ে উঠে পড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

সকলেই সাধুবাদ দিলো। আন্তরিক।

হেমমাসি বললেন, আমার কিন্তু পান চাই। কামতাপ্রসাদজী। কামতাপ্রসাদজী পান এগিয়ে দিতে দিতে বললেন মউসীজী আপনে রায়বেরিলিসে খাড়া হোনেপর ইন্দিরাজীনেভি ইলেকসানসে হার যাতি থী উন্‌কি মওতকে পইলেভি !

সকলেই হেমমাসির সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর চেহারার সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলেন। আরেক রাউণ্ড করে হুইস্কি হলো। মেয়েরা আর কোল্ড-ড্রিঙ্কস খেয়ে ক্ষিদে নষ্ট করতে রাজি হলেন না।

গিরিশ ভাইয়া বললেন পগাদাকে, বাঁয়া-তবলা ঢাকনাতে ভরতে ভরতে, দাদা, গানা যব্ বন্ধই হো গ্যয়া তো ঠুম্‌রীকি বারেমে হামলোঁগোনে কুছ শুননে মাঙ্গতা আপ্‌সে।

পগাদা লজ্জা পেয়ে বললেন আমি নিজে গান গাইতে পারি না বলেই কি এই শাস্তি দিচ্ছেন আপনারা আমাকে ? আপনাদের মতো গুণী-জ্ঞানীদের কিছু শোনানোর মতো বদ্‌তমিজি আমার যেন না হয়।

ঈ ক্যা বাত্। ই ক্যা বাত্। সাচ্‌মুচ্, থীওরি কা বারেমে হামলোগোনে তো আনপড় হ্যায়ই হ্যায়।

যাঁরা গান বা বাজান তাঁরা থীওরি গুলে খেয়েছেন। থীওরি তো শুধু বইতেই লেখা থাকে। থীওরি হলো আমার মতো নির্গুণদের জন্যে। আপনাদের মতো

প্রকৃত গুণীদের কিছু শেখানোর ধৃষ্টতা আমার নেই।

সমরেশ বললো, সে কথা নয় দাদা। আপনি যা বলবেন তার কিছু হয়তো এঁরা জানেন, কিছু কথা তো অজানাও থাকতে পারে? তাছাড়া শুক্লা বৌদি, গিরিশ ভাইয়া, কামতাপ্রসাদজী না হয় জানতে পারেন ঠুম্‌রীর বিষয়ে, আমি তো কিছুই জানি না। আমি তো জানবো না অনেক কিছুই। কি চাঁদুবাবু?

নিশ্চয়ই। আমিও তো জানি না কিছুই।

পগাদা গলা খাঁক্‌রে বললেন ধ্রুপদ থেকে যেমন খেয়াল এসেছে, শৈলীর পরিবর্তনে তেমনি আবার খেয়ালে রসের ও ভাবেব প্রাধান্য একটু বেশি করে দিয়ে ভাব একটু হালকা করে নিয়ে জন্ম হলো ঠুম্‌রীর। যদিও ঠুম্‌রী পুরোপুরিই বাগ-সঙ্গীতই কিন্তু তবু ভাব আর লচাও-এব রোশনাই মন ভরিয়ে দেয়। আপনারা যারা ক্লাসিক্যাল গান করেন বা তার সঙ্গে সঙ্গত করেন তাঁরা তো ভালো করেই জানেন যে খেয়ালে বর্ণের একটা স্বকীয়তা আছে, নিজস্ব একটা চাল আছে, অর্নামেন্টেশান, কিন্তু ঠুমরীর বেলাতে ভাব আর রসই প্রধান, সুব এখানে প্রয়োজনীয় উপবি। ঠুমরী যে ভাবে তার কথার বৈচিত্র্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্যে শ্রোতার মনকে নাড়া দিতে পারে, যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতও , তেমন খেয়াল ও ধ্রুপদ পারে না হযতো। সেই একটা চলতি গল্প আছে না যে এক সভাতে সাহিত্যিক শরৎবাবুকে (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) সমবেত সকলে বলেছিলেন, "আপনি যা লেখেন তাতে মন ভরে যায়, আর রবিবাবু (ববীন্দ্রনাথ) যা লেখেন তা বুঝতেই পারি না বা ভালো লাগে না" এমনই কিছু। তাতে শরৎবাবু নাকি হেসে বলেছিলেন যে "আমি লিখি আপনাদের জন্যে আর উনি লেখেন আমাদের জন্যে।" নিজেকে হেয় করলেও সেটা তাঁর মহত্ত্বই বলব। কারণ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া লেখক, গায়ক বাদক সব গুণী জনেরই জীবনের সবচেয়ে বড কামনা। যাঁরা সে জায়গা পান না তাঁদের অনেকেই সময় জায়গা পাওযা মানুষদের হেয় করতে দেখা যায়। সেটা অনেকটা ঈর্ষাজাত। এবং অনেকটা, যাঁরা তা করেন তাঁরা প্রকৃত শিল্পী-সত্তার অধিকারী নন বলেও। আবার জনসাধারণের হৃদয়ে সেই জায়গা, রাজার আসন পেয়েও অমন কথা শরৎবাবুই বলতে পারতেন কারণ তাঁর সমস্ত প্রাপ্তি সত্ত্বেও, অসীম জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, নিজের সম্বন্ধে কোনো মিথ্যে অহমিকা তাঁর ছিলো না। কোনো প্রকৃত গুণীরই তা থাকা উচিত নয়। ঠুমরী জনগণের চোখের মণি। আবার খেয়াল বা ধ্রুপদ হচ্ছে ঠুমরী গায়কদের চোখের মণি।

সমরেশ বললো, যেমন আমরা জানি যে টপ্পার আদি জন্মস্থান পাঞ্জাবে।

শোবি মিঞার টপ্পার কথা আমরা জানি। বাঙলা টপ্পার প্রথম প্রবর্তক বোধহয় নিধুবাবু। তাই না?

শুক্লা বললেন, ঠুমরী কিন্তু মানুষের মনে এমন জায়গা করে নিয়েছে যে অনেক টপ্পা আছে যাব চালও ঠুমরীর।

সমরেশের দিকে চেয়ে বললেন, যেমন নিধুবাবুর "তবে প্রেমে কী সুখ হতো গানখানি।"

ঠিক। সমবেশ বললো।

চাঁদু বললো, টপ্পাব বেলায় যেমন শোরি মিঞা বা নিধুবাবুর নাম আমরা জানি। ঠুমরীর বেলায় তেমন তেমন বিশিষ্ট মানুষ তো কেউ কেউ নিশ্চয়ই ছিলেন। তাঁবা কারা?

নিশ্চয়ই। তবে ব্যাপারটা কি? তুমি কি এবাবে সব জেনে শুনে আমাকে প্যাঁচে ফেলাব চেষ্টা কবছ?

পগাদা বললেন হাসতে হাসতে

সব জানলে আর দুঃখ ছিলো কি? তাছাড়া যাঁবা অনেকই জানেন, কামতাপ্রসাদজী বা গিবিশ ভাইয়াব মতো, তাঁবাও তো আব সব জানেন না।

সব কি আমিও জানি? বেশ মজা পেয়েছো তো তোমবা। "সবজান্তাবা" ছাড়া সব আর কেউই জানে না। জ্ঞানেব সীমা চিরদিনই ছিলো এবং থাকবে। শুধু মূর্খামিবই সীমা নেই।

সকলেই পগাদাব এই কথায় হেসে উঠলেন।

পগাদা বলুন, কথা ঘুবে যাচ্ছে কেবলি অন্যদিকে।

উৎসাহী ছেলেমানুষ সমরেশ বলে উঠলো।

পগাদা বললেন গান-বাজনা যাঁরা করেন সবাইই এসব জানেন তবে আমরা কেউই এখানে পেশাদাব নই বা সর্বজ্ঞ বলে কেউই নিজেকে দাবি কবছি না, তাই আলোচনাব জন্যেই আলোচনা করতে দোষ দেখি না। সকলে মিলে যে-কোনো বিষয়েই আলোচনা কবলে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু শেখা তো হয়ই! আমারও হবে এই ভেবেই, দু-এক কথা বলার সাহস কবলাম।

আবে বললেন আর কই? বলুন।

সমরেশ বলল।

ঠুম্‌রীব মধ্যে তো প্রধান পাঞ্জাবী ঠুম্‌রী আর পূর্বী ঠুমবী। পূর্বী এখানকার, মানে উত্তবপ্রদেশেব। বিশেষ করে বানাবসের। পাঞ্জাবী ঠুম্‌বীতে বিশেষ রকম হবকৎ থাকে কিছু তবকিব্‌-এব। অনেক সময পাঞ্জাবী ঠুংবীব বাণীগুলিও

পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা হয়ে থাকে। পাঞ্জাবী ঠুমরী বেশির ভাগই গাওয়া হয় দাদরা, কাহারবা, যৎ, দীপচন্দী এবং ত্রিতালে। কি গিরিশ ভাইয়া ? ঠিক কি না ?

বিলকুল ঠিক।

ঠুমরীর বর্ণদুটি কিন্তু অনেকটাই খেয়ালের অনুকরণে। গানের আগে বা মধ্যে ছোট ছোট শায়েরী থাকে। অনেকদিন আগে কিন্তু খেয়ালের মধ্যেও এরকম থাকতো। মিঞা কালে খাঁর গান যাঁরা নিজমুখে শুনেছেন তাঁদের কাছেই এ কথা শুনেছি। সত্যি-মিথ্যা জানি না। থাকতোই তো ! কামতাপ্রসাদজী বললেন। এ কথা আমিও শুনেছি।

আজকে ঠুম্‌রীর পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি ?

চাঁদু শুধোলো কামতাপ্রসাদজীর কাছ থেকে দুটি পান ও জর্দা চেয়ে নিয়ে।

স্নিগ্ধা হঠাৎ বললো, শতরঞ্জ কী খিলাড়ির।

বলেই, চুপ করে গেলো।

চাঁদু ও সমরেশ বোকা বনে গেলো।

সমরেশ বললো, মানে ?

পগাদার মুখে স্মিতহাসি ফুটে উঠলো।

গিরিশ ভাইয়া হৈ হৈ করে হেসে উঠে বললেন। ঠিক বোলিন্ বেহেন্‌জী।

পগাদা হেসে বললেন 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ি' সিনেমা দেখেই বেশির ভাগ শিক্ষিত বাঙালীও ওয়াজিদ আলি শাহ সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হন। কিন্তু দাবা খেলা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই ঐ মানুষটি করেছিলেন। আধুনিক ঠুমরীর জনক বলতে গেলে তিনিই। রবীন্দ্রনাথ যেমন রাগপ্রধান সঙ্গীতের ভয় ভাঙিয়ে বাঙালীকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে সহজ সরল পথে আলাপিত করিয়েছিলেন ওয়াজিদ আলী শাহও খেয়ালের ত্রাস ভাঙিয়ে সাধারণ শ্রোতাকে ঠুমরীর মাধ্যমে রাগ-রাগিণীকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। এই কাজটা বড় কম কাজ নয়।

শুক্লা বললেন। দাদা কিন্তু এ কথাটা খুবই ঠিক বলেছেন বলে মনে হয় আমার। লক্ষ্ণৌয়ের কাওসারবাগে আজ থেকে আঠারশো বছর আগে ওয়াজিদ আলী শাহ সাহেব যে গাছের চারাটি সযত্নে পুঁতেছিলেন সেই চারাই আজ মহীরূহ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষে অনেকেই রেডিও বা টি-ভিতে খেয়াল গান হলে মার্গ-সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলে রেডিও টি-ভি বন্ধ করে উঠে যান অথচ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গাওয়া "বাজুবন্দ খুলু খুলু যায়" বা আবদুল করিম খাঁ সাহেবের "যমুনা কে তীর", অথবা বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের "আয়ে না

বালম্" কিংবা উস্তাদ নাজাকৎ আলী খাঁ সালামাৎ আলী খাঁ সাহেবদের "সাইঞা বীণা ঘব শুন" শোনেন তখন তাঁরা একবারও ভাবেন না বা বোঝেন না যে মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই শুনছেন তাঁরা।

ঠিকই বলেছে শুক্লা। তবে ঠুমরীকে সাম্প্রতিক অতীতে এতো জনপ্রিয় করাব মূলে যে বিশেষ কয়েকজন মানুষ, তাঁদের নাম অবশ্যই প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখা উচিত। তাঁরা হলেন মৈজুদ্দিন খাঁ সাহেব, আবদুল কবিম খাঁ সাহেব এবং বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব। মেয়েদের মধ্যে বড়ে মোতি বাঈ, কলকাতার বিখ্যাত গহবজান বাঈ, আগ্রার মাল্‌কাজান বাঈ, বরোদাব হীরা বাঈ, রোশনাবা বাঈ, এবং অতি সাম্প্রতিক অতীতে বেগম আখতার ইত্যাদি।

শুক্লা বললেন, ঠুমরীকে দাদা আপনি হালকা বললেন বটে আমি কিন্তু মোটেই একে হালকা-ফুলকা বলতে রাজি নই। কারণ সত্যিই কোনো ঠুমরীর রসই হালকা নয়। আমি কিন্তু বিশেষ ভাবে নজর করে দেখেই একথা বলছি।

পগাদা বললেন, তুমি আমাব চেয়ে ভালো জানবে শুক্লা। তুমি তো নিজে গাও। তালিম নিযেছো। তবে আমার মনে হয় একটা লিমিটেশন আছে ঠুমরীব। জানি না, তোমবা কেউই লক্ষ কবেছো কি না, যে-লয়ে ঠুমরী সচরাচর গাওয়া হয় তাতে সব রাগ স্বচ্ছন্দে ব্যবহাব করা যায় না। তাইই দেখা যায় যে মেইনলি, খাম্বাজ, ভৈরবী, পিলু, মাণ্ড, বিহারী, ঝিঁঝিট্ ইত্যাদি রাগে ঠুমবী ভালো গাওয়া যায। সে কারণেই আজকে যে ঠুমরীগুলি আমরা বিন্দিয়া আর শুক্লাব মুখে শুনলাম সেকটি আমি বলব ; বেশ আন ইউজুয়াল। বাগের দিক দিয়ে।

লযেব জন্যে যে বাগের লিমিটেশন হয় তা তো টপ্পার বেলাতেও সত্যি। তাই না দাদা ? টপ্পাব বেশির ভাগ গানও তাই দেখা যায় কাফী, নয় খাম্বাজ, নয ভৈরবীতে বাঁধা।

সমরেশ বলল।

অন্যান্য বাগেও কিছু কিছু গান আছে। একেবারে যে নেই তা নয়। যেমন আজকেব ঠুমরীগুলি সচবাচব যে রাগে ঠুংরী গাওয়া হয় তা থেকে আলাদা। তবে তুমি যা বললে, তা ঠিকই।

পগাদা বললেন সমবেশকে।

টাক্সিটা ফিবে আসাব আওয়াজ হলো।

ভগাদা বললেন, এই চাঁদু, সুরজকে বল্ খাবারগুলো নামিযে নিতে বেয়ারাদের সঙ্গে। আমি এখুনি আসছি।

কোথা থেকে ? এত রাতে ? আবার চললেন কোথায ?

চাঁদু অবাক গলায় বললো।

শুক্লা বিরক্তির গলায় বললেন, কোথায় যাবে আবার এখন ? রাত এগারোটা বেজে কুড়ি।

পনেরো মিনিটে ফিরে আসছি। ডোন্ট ওয়ারী। বুটে বন্দুকের বাক্স আছে। ফেরার সময় তোমার বডি-গার্ড হয়ে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে সামনেব সীটে বসে থাকব।

স্নিগ্ধা, হেমমাসি অথবা পগাদা এবং চিত্রা বৌদি কিন্তু ভগাদার এই খামখেয়ালিপনাতে কিছুই বললেন না।

চাঁদু চলমান ট্যাক্সির দিকে মুখ বাড়িয়ে শুধোলো বিন্দিয়াকে পৌঁছে দিয়েছো তো বাড়িতে ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ক্লাবে যাবার আগেই। আসছি। আমার খাবার যেন গরম থাকে।

॥ আট ॥

গত রাতে খেয়েদেয়ে যাবার সময় ভগাদা বলে গেছিলেন "কাল সকালে পুজোমণ্ডপে একবার ঢুঁ মেরেই শিউপুরাতে চলে আসিস। বুঝলি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে বিকেল বিকেল শিবাজীরাও-এর কাছে যাবো তারপর নিচের উপত্যকায় তার বাজরা ক্ষেতে গিয়ে বসবো শুয়োর মারার জন্যে।"

চাঁদু বলেছিলো "খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা কোরো না। কালকে দুপুরের খাওয়াই এখনও হজম হয়নি। আমি খেয়ে দেয়ে দুটো-আড়াইটে নাগাদ পৌঁছব। কারণ উপত্যকায় যেতে হলে বাজীরাও-এর পাহাড়েব উপরের বাড়ি থেকে মাইল চারেক হেঁটে যেতে হবে। খাড়া উৎরাইও আছে তার মধ্যে বেশ কিছুটা। আর শুয়োর যদি সত্যিই মারতে চাও তো দিন থাকতে থাকতে গিয়েই বসতে হবে। রাতের অন্ধকারে নতুন লোকেব পক্ষে ওখানে পৌঁছতে বিস্তরই অসুবিধে হবে। ফেরবার সময় দরকার হবে। সঙ্গে একটা টর্চ নিও। আমিও একটা নিয়ে যাব পাঁচ ব্যাটারির টর্চ।"

ঠিক আছে। যা ভালো মনে করিস।

বলেছিলেন ভগাদা।

কাল থেকে কেবলি মনে হচ্ছিল চাঁদুর, যে মা-বাবা বেঁচে থাকতে এমন একটি পবিবারের সঙ্গে কেন তার আলাপ করিয়ে দেননি ? এরকম একটি পরিবার যে এখনও কলকাতায় আছে সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই ছিলো না।

প্যাণ্ডেল থেকে ফিরেই সামান্য খেয়ে নিলো চাঁদু। ব্যানার্জীদাদের, সুরজ ও

সুরজের গার্ল-ফ্রেণ্ড সকলকে দিয়েও গত রাতের লেফট-ওভার অনেকখানিই ছিলো ফ্রিজ-এ। সকালেই সুরজকে ছুটি দিয়েছিলো। বলেছিলো, বিকেল বিকেল যেন চলে আসে। কারণ রাতে ও ফিরতে নাও পারে। বাজীরাও-এর ক্ষেতে যাবে। নিজেই দুপুরের খাবার গরম করে খেয়ে নিয়েছিলো। তারপর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম। কাল শুতে শুতেও রাত একটা হয়ে গেছিলো। হুইস্কিও খাওয়া হয়ে গেছিলো অনেকগুলো। অনেকদিন পর।

যখন শিউপুরায় গিয়ে পৌঁছলো চাঁদু তখন আড়াইটা বাজে। বাইরের বারান্দাতে পগাদা, ভগাদা এবং স্নিগ্ধা তিন ভাইবোন বসে ছিলেন। চাঁদু যেতেই ভগাদা বললেন, অ্যাই দ্যাখ, তোর জন্যে বসে আছে স্নিগ্ধা। মোটর-সাইকেল চড়বে বলে। যেন স্কুলের মেয়ে!

দেরি হয়ে যাবে না?

মনে মনে খুশি হলেও মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে বললো চাঁদু।

পনেরো কুড়ি মিনিট যা না। ঘুরে আসবি। নইলে কি আর ছাড়বে? খুকি তো। উঠলো বাই তো কটক যাই।

ঠিক আছে। এসো।

চাঁদু বললো, স্নিগ্ধাকে।

স্নিগ্ধা বললো, আপত্তি? আপত্তি থাকলে যাবো না।

চাঁদু বললো, আপত্তির কি আছে?

আপত্তি না থাকতে পারে। উৎসাহ না-থাকলেও যাবো না। বলুন, উৎসাহ আছে।

চাঁদু মুখ নিচু করে থাকলো। ভাবলো, আচ্ছা মেয়ে তো।

মোটর সাইকেলের পিনিয়ন-এ ডান হাত রেখে খোলা-চুলের স্নিগ্ধা না-বসেই বললো, সীরিয়াসলি বলছি কিন্তু। বলুন, যে উৎসাহের সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছেন। তা না হলে আমার যেতে বয়েই গেছে।

ভগাদা বললো, তুই বড় পেছনে লাগিস চাঁদুর স্নিগ্ধা। যাবি তো যা। আমাদের সময় নষ্ট করিস না। বিগ-গেম হান্টিং-এ বেরোবো আমরা। সীরিয়াস অ্যাফেয়ার।

চাঁদু মাথা হেলিয়ে জানালো যে, উৎসাহ আছে।

মাথা হেলালে হবে না। মুখে বলুন।

আছে। এ কী রে বাবা।

বললো, চাঁদু।

স্নিগ্ধা পেছনে চড়ে বসলো। চাঁদুর সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেলো।

ডানদিকে বাইকের মুখ ঘোরালো ও। এদিকের পথটি বেশ ছায়াছন্ন। বড় বড় গাছ আছে। ডানদিক দিয়ে নালা বয়ে গেছে একটি। মছিন্দা জায়গাটার নাম। তার পরই পছিন্দা।

স্নিগ্ধা বললো জোরে চলুন। আপনি কত জোবে চালাতে পারেন দেখি তো।

চাঁদু বললো, অনেক জোবেই পারি কিন্তু পরের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জোরে চালাই না। একা থাকলে চালাই।

যে পারে, সে একাও পারে, দোকাও। স্পীড বাড়ান। তাছাড়া পর ভাবলেই পর। আপন ভাবলেই আপন। চাঁদু স্পীড বাড়ালো। এঞ্জিন সাড়া দিলো হ্যাণ্ডেলের অ্যাকসিলারেটরে মোচড় দিতেই। চোখে-মুখে জোর হাওয়া লাগছিলো। স্নিগ্ধার ফিনফিনে সুগন্ধি উথাল-পাথাল চুল উড়ে আসছিলো চাঁদুব মুখে-চোখে।

স্নিগ্ধা বললো, আরো স্পীড বাড়ান। আবো-ও-ও-ও। আমার খুব ভালো লাগে। স্পীড। আরও স্পীড।

ভালো করে জড়িয়ে ধরো আমাকে। পড়ে যাবে নইলে।

প্রেম হয়ে যাবে না তো?

চেঁচিয়ে বললো স্নিগ্ধা।

হাওয়া, ওর কথাগুলো নাড়িয়ে দিযে চুলেবই সঙ্গে এলোমেলো করে উড়িয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে উথাল-পাথাল হাওয়া তাদেব ফিরিয়ে দিলো আবার।

চাঁদু উত্তর দিলো না কোনো।

জবাব দিচ্ছেন না কেন?

গলা আরও তুলে চেঁচিয়ে বললো, স্নিগ্ধা।

এতো চিৎকার করে কথা বলতে পারি না আমি।

আমিও। কিন্তু এখন বলতে ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে অন্যরকম হতে ভালো লাগে না আপনার?

ঐরকমই চেঁচিয়ে বললো ও।

লা—গে।

চাঁদুও যতখানি পাবে গলা তুলে বললো।

আমার খু—উ—ব ভালো লাগে।

মাইল চারেক যাবার পর বাঁ দিকে সামনে পাহাড়ের কোলে সবুজ প্রান্তর।

তার আঁচল এসে পড়েছে পথের উপরে তার পাশেই, পথের কাছে কালো কালো গোলাকৃতি সব বড় বড় পাথর। প্রাগৈতিহাসিক আদিবাসী ছেলেদের কালো বুকের মতো চ্যাটালোও আছে কিছু। বড বড় শিশু আর করম গাছে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে জায়গাটা। জায়গাটা বেশ দূরে থাকতেই স্নিগ্ধা চেঁচিয়ে বললো, ঐখানে একটু বসব।

স্পীড কমিয়ে দিলো চাঁদু। তারপর রাস্তা ছেড়ে ঐ পাথরগুলোর কাছে গিয়ে থামালো বাইকটাকে।

নামো।

চাঁদুর কাঁধে হাত দিয়ে শাড়িটা উঁচু করে নিয়ে লাফিয়ে নামলো স্নিগ্ধা। বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে চাঁদুও নামলো। স্নিগ্ধা বললো, ঐ দূরেব পাথরটাতে বসব? বড চাতালেব মতো হয়েছে যেখানে?

চলো।

মিনিট তিনেক লাগলো জাযগাটাতে পৌঁছতে। স্নিগ্ধা বসেই বললো, বাঃ। কী সুন্দর জায়গাটা, না?

হুঁ।

ওব কথা শেষ হতে না হতেই ময়ূব ডেকে উঠলো পেছনের গাছ থেকে।

বাঃ। এখনও পৃথিবীতে ব্রজধাম আছে তাহলে। বিশ্বাস হয় না। কী বলুন?

চাঁদু চুপ করে থাকলো।

স্নিগ্ধা বললো, দূর। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। কী যে শুধু হুঁ-হাঁ কবেন। অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় তো ফুলঝুরি ঝরে। আমার কাছে বোবা হয়ে যান কেন?

হুঁ।

আবাবও হুঁ।

কাল রাতে তোমাব গান খুব ভালো লেগেছিলো। অত লোকেব সামনে বলতে পারিনি।

কেন? ভালো বলা তো কোনো গর্হিত অপরাধ নয়।

জানি। তবুও পাবিনি।

কেন? তাই তো জিগেস করছি।

লজ্জা করছিলো।

আমারও তাই। স্নিগ্ধা বললো। আপনি সত্যিই খুব ভালো গান। গানের চর্চা করেন না কেন?

সঙ্গী পাই না। সময়ও পাই না। এই ছোট্ট জীবনে কটি জিনিসের চর্চা করা যায় বলো?

সঙ্গী যদি কখনও পান তখনও হয়তো সময় পাবেন না। সময়কে কেড়ে পেতে হয়। সময় কি এমনি এমনি এসে কারো হয়?

তা অবশ্য ঠিক।

সময় নষ্ট না করলে একজন মানুষের হাতে অনেকই সময়।

তা ঠিক।

তোমাকে দেখে আমার খুব অবাক লাগে।

চাঁদু বললো।

কেন? আমি কি কোনো দুষ্প্রাপ্য পাখি?

না! তা নয়। তুমি যে জীবনে একটা বড় ধাক্কা খেয়েছো, দুঃখ পেয়েছো, তা তোমাকে দেখে বোঝাই যায় না। সত্যিই বোঝা যায় না।

একটুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে রইলো স্নিগ্ধা চাঁদুর চোখে।

তারপরই বললো, কীরকম দুঃখ? কোন দুঃখর কথা বলছেন আপনি? মানুষ হয়ে জন্মেছে অথচ কোনো দুঃখ পায়নি এমন কোনো মানুষের কথা আমি তো জানি না।

দুঃখের রকম আমি কেমন করে জানবো? কিন্তু কিছু মনে কোরো না, একটা কথা আমি বলবই যে, তোমার মতো মেয়েকেও যে-পুরুষের অপছন্দ হয় তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সত্যিই সন্দেহ জাগে।

আমার নিজেরও তাই জাগে।

বলেই, স্নিগ্ধা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো ওর দাঁতে। কিছুক্ষণ পূর্ণ দৃষ্টিতে চাঁদুর চোখে চেয়ে রইলো।

বিবশ হতে শুরু করলো চাঁদু। হাত-পায়ের সাড় দ্রুত চলে যাচ্ছে। মোটর সাইকেল আর চালাতে পারবে বলে মনে হয় না।

স্নিগ্ধা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেই বললো, আপনি কি করে আমার দুঃখের কথা জানলেন? বড়দা কিছু বলতেই পারে না। কারো কোনো পার্সোনাল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার রুচি অথবা সময় বড়দার নেই। বৌদিরাও আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কারও সঙ্গে করেন না। ছোড়দা কি কিছু বলেছে? কোন্ দুঃখের কথা বলছেন আপনি?

ছোড়দা?

অবাক গলায় চাঁদু বললো, না, না। ভগাদাও কিছু বলেননি তো।

স্নিগ্ধা আরও অবাক এবং সন্দিগ্ধ হয়ে বললো, তবে ? কার কাছ থেকে শুনেছেন ? আশ্চর্য। আমার দুঃখ অথচ আমিই জানি না। আমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়রাও কেউই কিছু জানেন না। অথচ আপনি তা নিয়ে দুঃখ পান।

এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাইনি স্নিগ্ধা। কিন্তু তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে মিশে আমার একথা বিশ্বাস পর্যন্ত হয় না।

কথাটা কি তা বলবেন তো খোলসা করে ?

তোমাব ডিভোর্স····।

হেয়ার-ট্রিগারে তর্জনী লেগে বেরিয়ে যাওয়া বুলেটের মতো কথাটা বেরিয়ে গেলো। ফেরাবাব আর উপায় নেই কোনো।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে স্নিগ্ধা বললো, ও ও ও···। ওর মুখের ভাব পাল্টে গেল মুহূর্তের মধ্যে। আমার ডিভোর্সের কথা ? তাতে আপনার দুঃখ পাবার কি আছে ? ডিভোর্স তো আজকাল কত মেয়েরই হচ্ছে। ও তো জলভাত। তাছাড়া যখন জানলাম যে ভদ্রলোক পারভার্টেড, বিচ্ছিরি-রুচির তখন···। মা আর দাদারা তো ঘর-বর ভালো কবে দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু কথা থাকেই যা স্ত্রী বা স্বামী না হলে জানা যায় না। দশ বছর ধরে মিশলেও না। আমার দুঃখের চেয়েও আমাব মায়ের, আমার দাদা-বৌদিদের এই আঘাতটা অনেক বেশি লেগেছে। ডিগ্রি আর শিক্ষা তো সমার্থক নয়। কোনো বিশেষ বিদ্যাও নয়। চারদিকে চেয়ে দেখেন না ? যাই হোক, আপনি যেন ভুলেও ওই কথা নিয়ে ওঁদেব সঙ্গে আলোচনা করবেন না। আমাকে বলেছেন নিছক আমার প্রতি করুণা বশত তা বুঝি। আপনাকে ধন্যবাদ যে····। কিন্তু কারো করুণাই যে আমি চাই না, চাইব না এ জীবনে কখনও। তবু, আপনাকে ধন্যবাদ আবারও নিশ্চয়ই দেবো। আপনি যে আমাকে মেয়ে হিসেবে অন্য একজন অপরিচিত পুরুষের তুলনায় যোগ্যতর বলে মনে করেন এটা কমপ্লিমেন্ট বই কি ! স্বীকার করতেই হবে।

চাঁদু বললো, পায়ের দিকে মুখ নামিয়ে, আমার এতো দুঃখ হয়, কথাটা ভাবলেই।

বুঝতে পাচ্ছি যে আমার এই দুঃখই আমার প্রতি আপনার মনে করুণা জাগিয়েছে এক ধরনের। কিন্তু আমার কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ হবার কি আছে ? জীবনটা তো নষ্ট হয়নি। আমি তো আর অন্য দশজন মেয়ের মতো "লোকে কি বলবে" ভেবে সমস্ত জীবনটা নষ্ট করিনি। নষ্ট হতে হতেও জীবনটা বেঁচে গেলো তা বুঝে স্বস্তিও পাচ্ছি খুবই। নষ্ট যা হয়েছে তা সামান্য সময়ই।

আমি তো আবার মুক্ত। বাকি আছে অনেক। জীবন তো অনেকই লম্বা কম কম করেও। অসীম ঐশ্বর্যময়! শরীরের, মনের; অতি সামান্যই তো খরচ হয়েছে। প্রায় সবটাই তো এখনও হাতে আছে। ইনট্যাক্ট।

চাঁদু কিছু না বলে করুণ মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্নিগ্ধা বললো, একটা কথা বলবেন?

কি?

ব্যাপারটাকে অত্যন্ত ক্লোজলি-গার্ডেড ফ্যামিলি সিক্রেট হিসেবেই রাখা হয়েছিলো। আর আমাদের তো দেখছেনই। আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। লেখাপড়া, গান-বাজনা, খেলাধুলো, শখের রান্না-বান্না অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী নানারকম সখ নিয়েই আমাদের সময় কেটে যায়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে সত্যিই আমাদের তেমন প্রয়োজন কোনোদিনও ছিলো না। পরিপূরকের অপেক্ষা যাদের আছে, তারা মানুষ হিসেবে অসম্পূর্ণ এমনই একটা ধারণা আমাদের বাবা আমাদের মধ্যে তৈরি করে দিয়ে গেছেন। উপদেশ দিয়ে নয়। তাঁর নিজের জীবন-যাত্রা, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই প্রমাণ করে গেছেন। মাও বাবার যোগ্য স্ত্রী ছিলেন। বাবা নেই বলে মা নিজে হয়তো কোনো শূন্যতা নিশ্চয়ই বোধ করেন কিন্তু আমাদের কখনও তা বুঝতে দেননি। বাবা যেমন ছিলেন, আমাদের মাও আমাদের সকলেরই বন্ধু। বৌদিদেরও। আত্মার আত্মীয়তাকেই আমরা চিরদিন আত্মীয় বলে জেনেছি। রক্তের আত্মীয়তা বা সামাজিক বন্ধনের আত্মীয়তা নয়। তেমন মনের মতো, রুচিমতো না হলে আমরা কখনোওই বন্ধুত্ব করিনি কারও সঙ্গেই। করুণা করবেন না প্লীজ আমাকে। কারো করুণাই আমার চাইবার নয়। প্রয়োজন নেই কোনোই।

স্নিগ্ধা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো, কী বলব। আমার বাবাকে যদি দেখতেন তাহলে আমার সম্বন্ধে কিছুটা বুঝতে পারতেন আপনি।

তারপরই বললো, আচ্ছা। এই খবরটা আপনাকে দিলো কে? সত্যি করে বলবেন?

তোমাকে মিথ্যে বলব তা তুমি ভাবলে কি করে?

না। আপনি যে ভালো মিথ্যে বলতে পারেন না, তা আপনাকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম। ভালো মিথ্যে সকলে বলতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্য পারে।

আমার মাসীমণি।

কি—র—ণ—মা—সী! উনি আপনাকে বলেছেন আমার ডিভোর্সের

কথা ? সত্যি ? ইনক্রেডিবল। যাই-ই হোক আপনি যখন জেনেই গেছেন আপনার কাছে সত্য গোপন করে লাভ কি ? তা-ই ভাবি, প্রথম দিন থেকেই আপনি আমার প্রতি এত নরম, সুন্দর ব্যবহার করছেন কেন ? এখন বুঝতে পারছি, একজন দুঃখ-পাওয়া মেয়ের প্রতি এ আপনার অনুকম্পা, করুণা, দয়া। আপনি সত্যিই মহানুভব। আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েও ছোট করব না।

চাঁদু চিৎকার করে বলতে চাইলো এ দয়া নয়, অনুকম্পা নয়, করুণা নয়। এ আমার অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসা।

কিন্তু মুখ ফুটে একটি শব্দও বেরুলো না। সব বক্তব্যই বুকের মধ্যে পুরোনো কফ-এরই মতো বসে রইলো। গলায় কিছুতেই উঠে আসলো না কিছুমাত্র, কথা হয়ে।

স্নিগ্ধা বললো, আমরা তো মাত্র আর পাঁচ-ছ' দিন আছি। এই ক'দিন আমাকে দয়া, করুণা বা অনুকম্পা কিছুই করতে হবে না আপনার। প্লীজ। নিজের দুঃখ আমি নিজে সামলাবার ক্ষমতা রাখি। বলেইছি তো। আমার মা-বাবা আমাকে তেমন ভঙ্গুর করে গড়েননি। কথাটা হয়তো বেশিবার বলা হলো কিন্তু মনে রাখবেন কথাটা। আর যে-কদিন আছি।

চাঁদু চুপ করেই রইলো।

স্নিগ্ধা বললো, চলুন। ফিরি। ছোড়দা রাগ করবে আর দেরি করলে।

দুজনে পায়ে পায়ে বাইকটার কাছে গেলো। স্নিগ্ধা উঠলো চাঁদু বসবার পরে। আলতো করে ওর পিঠে হাত রাখলো। তার পর পিঠ থেকেও হাত সরিয়ে নিয়ে সিটটাকে আঁকড়ে ধরলো দু' হাতে।

বললো, ফেরার সময় খুব আস্তে আস্তে চলুন। নইলে আমি পড়ে যেতে পারি। সময়ে সময়ে যেমন গতি, তীব্র গতি খুব ভালো লাগে, সময়ে সময়ে আবার ভালো লাগেও না।

চাঁদু কিছু বললো না। স্নিগ্ধার কথামতো আস্তে আস্তেই চালাতে লাগলো বাইক।

সমস্তটা পথ স্নিগ্ধা আর একটি কথাও বললো না।

চাঁদু বললো, কী হলো ? কথা বলছো না যে।

কী বলব ? সবসময় কথা বলতে ভালো লাগে না।

শিউপুরায় ফিরতেই স্নিগ্ধা পেছন থেকে নেমেই সোজা ভিতরে চলে গেলো।

ভগাদা একটু অবাক চোখে স্নিগ্ধার এই হঠাৎ পরিবর্তন এবং সোজা চলে যাওয়াটা মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করলেন। পগাদা তখন ছিলেন না বারান্দাতে।

তারপর চাঁদুকে বললেন কী রে ? আমার বোনকে বাইক থেকে ফেলে টেলে দিয়েছিলি নাকি ? যাবার সময়ে যা জোরে চালিয়ে গেলি। আমি ঠিক এই ভয়ই করছিলাম।

না।

চাঁদু বললো। অন্যমনস্ক গলায়।

ভগাদা বললেন, হট-নিউজ আছে। কাল রাতে পাহাড়ের উপর সন্নিসীবাবাদের আশ্রম থেকে একটি বাছুর ধরে নিয়ে গেছে হুণ্ডারে। শিবাজীরাও এসে বসে আছে। আধখানা খেয়েছে, বাকি আধখানা খেতে আজ রাতে নির্ঘাৎ ফিরে আসবে বাছাধন। তাই শিবাজীরাও "কিল"-এর উপরে মাচা বেঁধে এসেছে। বেলাবেলি গিয়ে বসতে হবে। আসবে আর গদ্দাম করে দেগে দেব। একেই বলে কপাল। শিকার করতে চাইলাম শুয়োর আর কপালে নাচছে হুঁ হুঁ রবে হুণ্ডার। বুঝলি না, একেই বলে লুটি তো ভাণ্ডার মারি তো হুণ্ডার।

হ্যাঁ।

চাঁদু বললো। অন্যমনস্ক গলায়। গণ্ডারের জায়গায় যে ভগাদা হুণ্ডাব বললেন তা খেয়ালই করলো না।

মনে মনে নিজেরই মুণ্ডপাত করছিলো ও। মাসীমণি তো বার বার করে নিষেধই করেছিলেন। তা করা সত্ত্বেও ঐ প্রসঙ্গ তোলা ওরই অন্যায় হয়েছে। নিজের পায়ে কুড়ুল ও নিজেই মেরেছে। এখন···

এ শিবাজীরাও। কাঁহা হো তুম ? জলদি আও।

বাজীরাও দারোয়ানদের ঘর থেকে দৌড়ে এলো।

ভগাদা বললেন, তুই চল, চাঁদু মোটর সাইকেল নিয়ে। আমি বন্দুক আর শিবাজীরাওকে নিয়ে ইমরানকে সঙ্গে করে এগোচ্ছি। জায়গাটা শিবাজীরাও এর বাড়ি থেকেও নাকি মাইল খানেক নিচের ঐ উপত্যকারই লাগোয়া।

তুই শিবাজীরাও-এর বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা কর। আমরা পৌঁছচ্ছি এখুনি। গাড়িও যাবে জায়গাটা পর্যন্ত। ওর বাড়ি থেকে একসঙ্গে রওয়ানা হবো। তখন তুই পেছনে পেছনে আসবি। তারপর ইমরানের সঙ্গে শিবাজীরাও ফিরে যাবে। তুই আর আমি মাচায় বসব। বুয়েচিস। হোল-নাইট থাকতে হতে পারে। তোর জন্যে একটা কম্বল নিয়ে নিই ?

লাগবে না। চাঁদু বললো।

জোরে মোটর সাইকেল চালিয়ে চাঁদু পৌঁছে গেলো অনেক আগেই বাজীরাও-এর ডেরায়। মালতিও লক্ষ করেছিলো চাঁদুর এই অন্যমনস্কতা।

বললো, তবিয়ৎ গড়বড়ায়া গ্যয়া ক্যা ?

নেহি। নেহিতো ভাবীজী।

চাঁদু বললো।

তারপর বললো, সকলে মিলে যেন লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরে একদিন তার কোয়ার্টারে গিয়ে কাটিয়ে আসে। বহুদিন তো যায়নি। ওরা। এইবার এই মেহমানদের জন্যে ওদের দেখভাল করতে পারলো না পুজোর সময়ে।

মাল্‌তি বললো, বাজরা না উঠলে কোথাওই যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে একটি বাখোয়ার ছেলে যোগাড় হয়েছে। পবননন্দনজীর কৃপাতে। এবার থেকে রাতে সে-ই ক্ষেত পাহারা দেবে। দিনকাল বড় খারাপ হযে গেছে। বাতে একা বাড়িতে থাকতে আমার ভয় করে। নির্জন পাহাড়ে। কালিকুয়োয় জল নিতে যাই। উঁচুজাতেব লোকেরা অনেকেই নানারকম ভয় দেখায়। লোভও।

ছেলেটির বয়স কত ?

বাখোয়াব ছেলেটির ?

কোনো মেয়ের সম্বন্ধেই ও আর কোনো ঔৎসুক্য রাখে না এমনই গলায় বললো চাঁদু।

মাল্‌তি একটু আহত হলো চাঁদুব ভাবে।

বললো দশ সাল।

চাঁদু শুনে অবাক হয়ে গেলো। সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক থাকলে তাও অন্য কথা ছিলো। রাতের পর রাত ঐ জনমানবহীন পনেরো-কুড়ি বর্গমাইল উপত্যকার রাতের গা-ছমছম পরিবেশে নানারকম জানোয়ারের মধ্যে ঐ চারদিক-খোলা চালা-ঘরে দশ বছরের একটি ছেলে ক্ষেত পাহারা দেবে ! ভাবাও যায় না, বড বাঘ নেই যদিও কিন্তু চিতা বাঘ আছে। বুনো শুয়োরই যথেষ্ট। শজারু আছে বড় বড়। হুণ্ডার। ঘোড়ফরাসের দল। এক চাঁট মেরে দিলে মাথার খুলি ফেটে চৌচির হযে যাবে। ধন্যি সাহস ছেলেটির।

কি পাবে বদলে ? ছেলেটি ?

কুড়ি কেজি কাঁচা বাজরা। যখন ফসল উঠবে। শুখা নয়। ওর আর কেউই নেই। দূরের এক গ্রামে বাড়ি। ওর বাবা-মাকে পুড়িয়ে মেরেছে রাজপুতরা গ্রাম-শুদ্ধ লোকের সঙ্গে কিছুদিন আগে। ও পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।

প্রাণে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কী না সে বিষয়ে সন্দেহ হলো চাঁদুর।

ওও জাতে চামাব। ওর জন্যেও আমাদেরই পাশে একটি ঘর বানাবো আমরা কাল থেকে। আমাদের সঙ্গেই থাকবে। কোথায়- আর যাবে বেচারা।

মাল্‌তি বললো বটে। কিন্তু চাঁদুর মনে হলো, ছেলেটিকে প্রায় বণ্ডেড লেবারেরই মতো রাখবে মাল্‌তিরা। সুযোগ পেলে বড়লোকেদের মতো গরিবরাও অন্যকে ঠকাতে দুবার ভাবে না। ঠকাবার রকমটা শুধু আলাদা। আর পরিমাণটাই। ভেবে দুঃখ পেলো চাঁদু। চাঁদু নিজে যে জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত এবং এই পগাদা-ভগাদা-স্নিগ্ধারাও, তাতে এই সব মানুষের কথা খবরের কাগজে পড়া ছাড়া অন্য কোনো ভাবেই জানার কথা নয় ওদের। মাঝে মাঝেই চাঁদুর নিজের ওদের প্রতি দরদ এবং ভালোবাসাটা মেকি কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে। তারপরই ও ভেবেছে ও তো তবুও কিছু দরদ রাখে। এখানে ওই হঠাৎ-আসা ভগাদারাও। কিন্তু বাজীরাওদের মতো ঐ ছেলেটির মতো হতভাগ্যদের যতদিন দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া না যাচ্ছে, যতদিন না চাঁদুরা সকলেই ওদের সাহায্যের, সহানুভূতির হাত আন্তরিকভাবে বাজীরাওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে না যাচ্ছে, নিজেদের কিছু ছেড়ে ; কিছু সময়, কিছু ভোগ, কিছু সম্পত্তি ; ততদিন এরা সব সময়েই পেছন দিকে টেনে রাখবে এই দেশকে। ওদের অবস্থা না ফিরলে, ওরা মাথা তুলে না-দাঁড়ালে শুধু চাঁদুদের উন্নতি দিয়ে কোনোই লাভ হবে না। বাজীরাওদের কথা ভাবলেই, নিজেদের উপর-মহলের নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অনুভূতিগুলিও সবই কখনও কখনও বিলাসিতা বলে মনে হয়। কিন্তু সব মহলের মানুষই মানুষ। মূল অনুভূতি, প্রবৃত্তি এই সব প্রত্যেক মানুষেরই একই। তবে এখনও যে এই রকম সহানুভূতিশীল একটি মন বাঁচিয়ে রেখেছে, রাখতে পেরেছে নানারকম বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও, তার জন্যেই কৃতজ্ঞ বোধ করে চাঁদু ওর সৃষ্টিকর্তার কাছে। তার নিজের যেমন মমত্ববোধ আছে বাজীরাওদের প্রতি, ও স্বাভাবিকভাবেই আশা করে যে বাজীরাওদেরও সেই রকমই মমত্ববোধ থাকবে ঐ রাখোয়ার ছেলেটির প্রতিও। যে, অনাথ ; আশ্রয়হীন।

চাঁদু শুধোলো, ছেলেটির নাম কি?

চান্দু।

মজা লাগলো চাঁদুর। ওর নামেই নাম। নেমসেক।

ওর ঘর বানাতে কত খরচ হবে?

খরচ আর কত হবে? কাঠ তো ওরা দুজনে মিলে কেটেই আনবে। মানে বাজীরাও আর ও। মাটি কিনতেও পয়সা লাগবে না। খুঁড়ে বের করব আর নিজেরাই হাতে করে বানাবো ঘর। মজুরিও লাগবে না। শুধু খাপরারই যা খরচ।

চাঁদু বললো, আমি এরই মধ্যে একদিন এসে কিছু টাকা দিয়ে যাবো। শীতও পড়লো। ওর জন্যে একটা রজাই আর জামাকাপড় কিনে দিও। তোমাদেরও শীতের জন্যে যা লাগবে।

মাল্‌তি বললো দেভরজী,তুমি আর কত দেবে ? তুমি গতজন্মে আমাদের কে ছিলে তা জানি না। তবে আমার ছেলেকে আমি এই কথাই সবসময় বলবো যে বড় হয়ে তোমার ঋণ শোধ করতে না পারুক, স্বীকার যেন করে।

চাঁদু হেসে বললো, গতজন্মের কথাই যদি বলো তো তোমাদের কাছে আমারও গতজন্মে যে অনেক ঋণ ছিলো না এবং সেই ঋণই আমি শুধু স্বীকার করারই চেষ্টা করছি তাও তো হতে পারে ! ওসব কথা বোলো না। যে-কোনো মানুষই অন্য মানুষের জন্যে, নিজের স্বার্থের জন্যে যা করে সেটাকে করা বলে না। সেটা নিছকই লেন-দেন। স্বার্থ ছাড়া কারো জন্যে কিছু করাটাই আসল করা। তার মধ্যেই যে যা-কিছুই করে তার সবটুকু আনন্দ। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কারো জন্যে তোমার ছেলে বড় হয়ে অথবা তোমরা নিজেরা বড়লোক হয়ে যদি কিছুমাত্রও করো তাতে যে আনন্দ পাবে মনে তাতেই দেখবে সব শোধ-বোধ হয়ে যাবে।

মাল্‌তির চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। বললো, ভগবান তোমার ভালো করুন।

বলেই বললো, দেভরজী, একটা কথা বলব ?

কি ?

অপরাধ নেবে না, বলো।

বলো না।

ঐ যে শিউপুরার দিদিমণি, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মেয়ে ; তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে বড মানাতো। যেমন রূপ, তেমন গুণ। বাড়িশুদ্ধু সকলকে দেখে, ওঁদের ব্যবহারে আমরা এতোই খুশি, ওঁদের সঙ্গে তোমার এতোই মিল যে ঐ দিদিকে দেখার পর থেকে আমরা দুজনে শুধু এই কথাই আলোচনা করছি।

চাঁদু কিছু না বলে মুখ নিচু করলো।

তারপর বললো, দিদিমণি যে খুবই ভালো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। পুরো পরিবারই চমৎকার। কিন্তু আমি কি তার যোগ্য ? তাছাড়া পড়ে-লিখে জেনানারা নিজেদের ইচ্ছেমতোই বিয়ে করে। তোমাদের মতো তো সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় না তাদের। তার আমাকে পছন্দ হলেই না এ সব কথা ওঠে।

তোমাকেও পছন্দ হবে না এমন মেয়ে আছে না কি ?

মাল্‌তি বাঁ হাতের তর্জনীটি গালে ঠেকিয়ে সত্যিই অবিশ্বাসের গলায় বললো।

আছে ভাবীজী। সংসারে সকলেরই কি সকলকে পছন্দ হয়? তাইই যদি হতো তবে তো একটি পুরুষকেই সব মেয়ে বিয়ে করতে চাইতো অথবা সব পুরুষ চাইতো একটিই মেয়েকে। ভাগ্যিস তা' হয় না বাস্তবে। হলে তো দাঙ্গা লেগে যেতো।

মাল্‌তি হেসে ফেললো চাঁদুর কথায়। বললো, এটা ভাবার মতো।

এমন সময় ইমরানের ট্যাক্সি এসে বাজীরাও-এর ডেরাতে হাজির হলো। মাল্‌তি বাজীরাওকে বললো, চান্দু ঐ মাচানেই আছে এখন।

বাজীরাও ইসারা করলো চাঁদুকে, মোটর সাইকেলে ট্যাক্সিকে ফলো করতে। তাইই করলো চাঁদু। ভগাদা ট্যাক্সির জানালা দিয়ে হাত নাড়লো মাল্‌তিকে। সন্ধে হতে আর মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাকি। তাই তাড়াতাড়ি করছে বাজীরাও।

জায়গাটাতে পৌঁছেই চাঁদু দেখলো যে পাহাড়ী ঝরনাটা যেখানে কালো পাথরের একটা বিবাট চওড়া ফালিকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে নিচের উপত্যকাতে গিয়ে পড়েছে তারই একেবাবে পাশে উপত্যকার গায়েই ঘন জঙ্গল। ট্যাক্সি থেকে নেমেই বাজীরাও কথা না বলে ইমরানকে ইসারাতে গাড়ি নিয়ে দূরে চলে যেতে বললো। চাঁদুকেও ইসারাতে বললো মোটরসাইকেলটার স্টার্ট বন্ধ করে ঠেলে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে কতগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই-এর আড়ালে রেখে আসতে। তাইই রেখে এলো চাঁদু।

এমন সময় ভূতেরই মতো নিঃশব্দে, ভূতেরই মতো দেখতে একটি ছোট্ট ছেলে নেমে এলো একটি সাহাজ গাছের ওপর থেকে। ন্যাড়া-মাথা। ও নামতেই গাছটাকে ভালো করে লক্ষ করে দেখলো চাঁদু যে একটি মাচা বাঁধা হয়েছে তাতে। এবং মাচার নিচে পুটুস ঝোপের ভেতরে গাছের ছায়াতে সাদা বাছুরের অবশিষ্টাংশও পড়ে আছে। বেশিটাই খেয়ে গেছে।

ফিসফিস করে বাজীরাও চাঁদুদের বুঝিয়ে দিল কী হবে ওদের মোডাস-অপারেণ্ডি। হুণ্ডারটার উঠে আসার সম্ভাবনা উপত্যকা থেকেই। দুপুরের রোদে ঐ নালারই কাছাকাছি বড় ঘাসের মধ্যে বা কোনো গাছের ছায়াতে নিশ্চয়ই সে শুয়ে আছে।

চাঁদু তো দর্শক। শিকারী ভগাদাকে বাজীরাও বললো যে হুণ্ডারকে দেখতে পেলেই যেন হড়বড় করে গুলি না করেন। সন্ধের পর পরই, এমন কি এখনও সে চলে আসতে পারে। এসে যখন খাওয়া আরম্ভ করবে, খেতে খেতে অন্য

কোনো দিকেই আর খেয়াল থাকবে না তার, ঠিক তখনই চাঁদুবাবু আলো ফেলবেন আর ভগাবাবু ঘোড়া দাবাবেন। প্রথম গুলি লাগলেও আরও একটি গুলি করবেন। সাবধানের মার নেই। আর যদি গুলি খেয়ে অথবা না খেয়েও হুণ্ডারকে পালিয়ে যেতে দেখেন, তখনও গাছ থেকে মোটে নামবেন না। পাথরের উপরে পায়ের ছাপ ভালো বোঝা যায় না তো! এটা হুণ্ডার না হয়ে শোন্‌চিতোয়াও হতে পারে। শোন্‌চিতোয়া হলে খুবই খতরনাক্। আহত শোনচিতোয়া।

ভগাদা কানে কানে বললো, একী ঝামেলারে শালা! আমি তো কাঁটাল-মারা শিকারী। আমি কী অতো ভালো শিকারী যে চিতা মারবো? খেয়ে ফেলবে যে র‍্যা!

চাঁদু বললো, এখন রণে ভঙ্গ দিলে ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবে। পার্কালাম।

বাজীরাও ওঁদের গাছে চড়িয়ে দিয়ে বলে গেলো যে গুলির শব্দ শুনলেই ইমরান আর ও গাড়ি নিয়ে আসবে। আর যদি রাত নটার মধ্যেও না দেখা দেয় হুণ্ডার অথবা শোন্‌চিতোয়া তবে নামবার আগে খুব ভালো করে চারধার টর্চ জ্বেলে দেখে নিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে আপনারা নিজেরাই ফিরে আসবেন। পথে তো ভয়ের কিছু নেই। রাত নটা অবধি ইমরানকে আমার ওখানে রেখে তারপর নিচে পাঠিয়ে দেবো।

চাঁদু, তার নেমসেক চান্দুকে দেখছিলো। একটি ছেঁড়া কালো জামা গায়ে। পরনে একটি খাকি হাফ-প্যান্ট। তাও খাবলা-খাবলা ছেঁড়া। ন্যাড়া মাথায় একটা গামছা জড়ানো। মাচায় বসে, বাজীরাও-এর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে চলে যাওয়া চান্দুকে দেখে চাঁদু ভাবছিলো নেহাতই এক দুর্ঘটনাবশতই "চান্দু" ও "চাঁদুর" জীবন কতো অন্যরকম। অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত বাবা-মায়ের ঘরে জন্মেছিলো বলে চাঁদু আজকের চাঁদু। আর গরীবস্য গরীব, "ছোট জাতের" ঘরে জন্মেছিলো বলে দশ বছরের চান্দু এবং তার ভবিষ্যৎ কত্ত অন্যরকম। এই জন্মগত পার্থক্য বড় লজ্জাকর। চাঁদু যে সুযোগ পেয়েছে জীবনে সেই সুযোগ চান্দু পেলে হয়তো চাঁদুর চেয়ে আরও কত্ত বড় হতে পারতো!

আগুনে পুড়ে মরা মা-বাবার শ্রাদ্ধ করেছে বলেই ন্যাড়া মাথা এখনও চান্দুর।

মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেলো চাঁদুর। স্নিগ্ধার ব্যাপারে মনটা তো খুব খারাপ হয়ে ছিলোই! তবে এই মন-খারাপটা অন্যরকমের। খারাপ ও ভালোও কতরকমের হয়! আর মনের ভালো-খারাপের তো কথাই নেই।

মাচায় বসতেই ভগাদা উঁ-আঁ করে এ পাশ ও-পাশ করতে লাগলেন।

মাচা, ঐ নামেই ! টাঙ্গি দিয়ে চেরা কয়েকফালি তক্তা বিছিয়ে লতা দিয়ে বেঁধে দিয়েছে আড়াআড়ি করে দুটি ডালের ওপর বাজীরাওয়েরা। ওদের এরকম আসনে বসা অভ্যেস আছে। চাঁদুদের নেই। কাঠের কোনাগুলি উঁচু উঁচু হয়ে আছে। শহুরে বাবুদের ফোম কুশনে বসা-অভ্যস্ত পেছন প্রতিবাদ করে উঠছে। তবে ভগাদা যতখানি করছেন সেটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো চাঁদুর।

ফিসফিস করে ভগাদা বললেন, একটা ফোঁড়া হয়েছে বেজায়গায়। পেকে একেবারে টনটন করছে। এই কারণেই গতকাল তোর বাড়িতে গানের ম্যায়ফিলটা পর্যন্ত ভালো করে এনজয় করা গেলো না। দেখিসনি ? বার বার বাথরুমে যাচ্ছিলাম ? তুলোটা ঠিক করতে। উঃ। পুরো পেছনটাই দপদপ করছে। বারান্দাতে চেয়ারেও তো বালিশ পেতেই বসেছিলাম। লক্ষ করিসনি বোধহয়। বালিশটা গাড়িতেও এনেছি। গাড়িতেও বালিশ পেতে বসেছিলাম।

তা এখানেও বা আনলেন না কেন ? এমন অবস্থায় হুণ্ডার মারতে আসার দরকার কী ছিলো ? এখন নিজের ফোঁড়া সামলাবেন ? না হুণ্ডার ? আমি তো বন্দুক জন্মে ছুঁড়িনি।

এলাম। পাছে ওরা হাসে। তাছাড়া সাদা বালিশ দূর থেকে হুণ্ডার দেখে ফেলতে পারে। শিকার না করলে কী হয় ! শিকারের বইতো পড়েছি দু চারটে ! কিছু তো জানি।

তোমার পেছনে ফোঁড়া, তা তো ওরা জানে না। এতে হাসবার কী ছিলো ?

ছ্যাঃ। কী ভাবতো ! হুণ্ডার শিকার করতে এসেছে বালিশে বসে। হুণ্ডার তো ছেড়ে দে, বালিশে বসে গণ্ডার শিকার করলেও লোকে হাসতে পারে।

নিচের উপত্যকাটা এখন দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিলা। সেদিকেই চাঁদু তাকিয়েছিল। হঠাৎই ভগাদা চাঁদুকে খোঁচা মারলেন আঙুল দিয়ে। অন্যদিকে চেয়ে দেখে, শেষ বিকেলের শারদ আলোয় একদল ঘোড়ফরাস খুউব আস্তে আস্তে উপত্যকার মধ্যে চরতে চরতে এগোচ্ছে। বর্ষার জল-পাওয়া উপত্যকার সতেজ সবুজ ঘাসে ওদের হাঁটু অবধি ডুবে রয়েছে। নীলচে-ছাই রঙা শরীরে বিধুর সোনালি রোদ লেগেছে। চমৎকার দেখাচ্ছে।

কী ?

ভগাদা উত্তেজিত হয়ে বললেন। কী রে ওগুলো ? কখনও দেখিনি ! কী জানোয়ার রে শালা ? জংলী ঘোড়া নাকি ?

ঘোড়ফরাস।

চাঁদু বললো।

সেটা আবার কী মাল র‍্যা ? ফোঁড়া কচ্চে ধড়াস-ধড়াস আর তার মধ্যে ঘোড়পরাস !

হাসি চেপে চাঁদু বললো, নীল গাই। ব্লু-বুল। তারপর চাঁদু বললো দ্যাখেননি কি আর ? দেখেছেন ঠিকই। তবে চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার ন্যাড়া, লোহার গরাদ-ঘেরা পরিবেশে কোনো জানোয়ারকে দেখারই মানে হয় না। ভালো করে দেখুন।

চাঁদু ভাবছিলো এই দলটি যদি দয়া করে আজ রাতে বাজীরাও-এর ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছে যায় তো ফসলের কিছু আর বাকি থাকবে না। উত্তরপ্রদেশে, বিহারে এবং অন্যান্য জায়গাতেও নামের পেছনে 'গাই' কথাটা থাকায় এদের মারা আর গো-হত্যা করা সমান অপরাধ বলে গণ্য হয়। বিহারে এদের বলে ঘোড়ফরাস্। গাই-এর চেয়ে ঘোড়ার সঙ্গেই কিন্তু এদের মিল বেশি। অথচ এরা গরুও নয় ঘোড়াও নয়। একধরনের এন্টেলোপ। কত রকমের কুসংস্কার যে এখনও বেঁচে আছে আমাদের দেশে। চান্দুর মা-বাবাদের মতো কত লোককে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে তারা হরিজন বলে, বিন্দিয়ার বিয়ে হলো না, হবে না, ভরত, জাতে যাদব তাই। এদিকে বাজীরাও-এর বুকের রক্তঢালা সারা বছরের খাদ্য-সংস্থান নীলগাই-এর দল খেয়ে ফেললেও তাদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না নামের পেছনে "গাই" আছে বলে। অবশ্য কিছু শস্যের বিকল্পে কিছু বন্যপ্রাণী বাঁচানো উচিত কী উচিত নয় এটা একটা ভাববার মতো প্রশ্ন। কিন্তু বাজীরাওদের মতো গরিব, যাদের বাঁচার আর কোনো পথই নেই তাদের তাহলে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা বা ভরতুকি দেওয়া উচিত বন-বিভাগ থেকে। এতো সব কথা ভাবার সময় কার আছে ?

নীলগাইরা অদৃশ্য হলে চাঁদু বাছুরটার দিকে তাকালো। বাছুরটার পেছন থেকে খেয়েছে। যে জানোয়ারেই খাক। একটা করে পা, সামনের ও পেছনের। জংলী হিংস্র জানোয়ারে খাওয়া গৃহপালিত পশু এর আগে আর কখনই দেখেনি চাঁদু।

উপত্যকা থেকে নানারকম পাখি ডাকছিলো। চিংকারা হরিণের একটি দল এখানে তো আছেই। তবে তারা উপত্যকাতে বিশেষ নামে না। মালভূমির উপরের বিস্তৃত এলাকাতেই ঘুরে বেড়ায়। চিংকারাদেরও খুব কাছ থেকে কখনও দেখেনি চাঁদু। তবে বাজীরাও-এর কাছে শুনেছে যে, "চিংক্-চিংক্" কর ডাকে বলেই ওদের নাম নাকি চিংকারা।

অন্ধকার হয়ে গেলো। এবার উপত্যকা থেকে একজোড়া টি-টি পাখি

টিটির-টি-টি টিটিরটি করে ডাকতে ডাকতে ঝরনার রেখা বরাবর উড়ে আসছিলো। উপত্যকা থেকে উঠে আসছিলো। পাখিগুলো কেন ডাকছে কে জানে! একজোড়া পেঁচা ঝগড়া করতে করতে, উড়তে উড়তে অন্ধকার আকাশে ঘুরতে ঘুরতে দূরে চলে গেলো কিঁচি-কিঁচি-কিঁচর করে ডেকে মালভূমি আর উপত্যকাকে একটি আধিভৌতিক মাত্রা দান করে। গা-ছমছম করে উঠলো চাঁদুর।

এমন সময় হঠাৎ ভগাদা বললেন: উঃ-রিঃ- বাঃ-বাঃ। বাঃ-বাঃ রেঃ-রেঃ-মাঃ।

হঠাৎ ভগাদার এই উৎকণ্ঠিত অবস্থায় সরগম সাধনা করার করার সাধ কেন হলো তা বোঝবার চেষ্টা করে চাঁদু বললো, কী হলো?

ফোঁড়াটা! আর পারছি না।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভগাদা চাঁদুকে বললেন।

ঠিক সেই সময়ই একটা খচর-মচর শব্দ শোনা গেলো ঝরনার পাশের ঝাঁটি জঙ্গলে। ইংরিজিতে এমন সময়কেই বোধহয় বলে "জাংচার"। কিন্তু কিছুই দেখা বা বোঝা গেলেন না। কী জানোয়ার হতে পারে!

ভগাদা বললেন, আলো দিস্ কিন্তু ঠিক করে ব্যারেলের উপরে। এবারে ঠিক রেডি হয়ে বসি। বি ভেরি কেয়ারফুল। ভেবি ভেরি!

শিকার করবেন ভগাদা,চাঁদু মাচায় বসে কেয়ারফুল হয়ে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছিলো না। এমন সময় খচর-মচর শব্দটা হঠাৎই মাচার খুবই কাছে চলে এলো। কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। চারদিকে গাছের ছায়া। ভগাদা চাঁদুকে আলো জ্বালবার সুযোগ না দিয়েই অন্ধকারেই শব্দের দিকে নল ঘুরিয়ে হঠাৎ শব্দভেদী গুলি করে দিলেন। গুড়ুম আওয়াজে শব্দ ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদু আলো জ্বাললো। দেখা গেলো এক জোড়া শেয়াল ভগাদা এবং চাঁদুর চেয়েও বেশি ভয় পেয়ে ঝরনার পাথরের কাছে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মাচার দিকে চেয়ে। আলোতে তাদের দু জোড়া লাল চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলে উঠতেই ভগাদা বললেন: লেপার্ড! বলেই, আবার গুলি এবং এবারে গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাতব আওয়াজ। লেপার্ডের শরীর যে ধাতুতে তৈরি হয় সে কথা কোনো বইতেই পড়েনি। চমকে গেলো চাঁদু,কী হলো বোঝার আগেই শেয়াল দম্পতি অলিম্পিক-স্প্রিন্টারের মতো দৌড় লাগিয়ে পগারপার হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভগাদা চিৎকার করে উঠলেন: আঃ।

রিঃ-রিরি-রে-মা আঃ।

একেই তো ধাতু-নির্মিত চিতাবাঘের উপস্থিতিতে চাঁদু শঙ্কিত হয়েই ছিলো তার উপরে আবার হঠাৎ কোন্ রাতের "পকড়" নিয়ে পড়লেন এই অসময়ে ভগাদা তা বুঝতে না পেরে চাঁদু বললো, কী হলো ?

ফোঁড়া ফাটলো। আঃ কী আরাম রে চেঁদো। কী আরাম। কোনো শালা বাঘ-শিকারী কোনোদিনও জানবে না যে একটা টন্‌টনে পেল্লায় ফোঁড়া ফাটার আরাম দশটা বাঘ মারার আরামের চেয়েও বেশি। কী মজা রে চেঁদো। এতো আনন্দ বহু বছর পাইনি !

এদিকে পর পর দুটি গুলির শব্দ শুনে ইমরান ওদের নিয়ে আসছে। দূর থেকে হেডলাইটের আলো দেখা গেলো। অ্যাম্বাসাডর গাড়ির এঞ্জিনের শব্দও। অসমান বন্ধুর পথহীন মালভূমিতে ঝাঁকতে ঝাঁকতে আছাড় খাচ্ছে হেডলাইট দুটোর আলো। যত জোরে পারে আসছে ইমরান। চাঁদুদের টেনশন ফোঁড়া ফাটার সঙ্গে শেষ। ইমরানদেব গুলির শব্দের সঙ্গে শুরু।

চল। নামি চেঁদো। ভগাদা বললেন।

দাঁড়াও না। ওরা আসুক।

ওরা এলে কী বলব ?

তা আমি কী করে বলব ? চাঁদু বললো। আপনি কী দেখে কিসে গুলি করলেন তা আপনিই জানেন। প্রথম গুলি তো শেয়ালদের। যদিও লাগেনি। দ্বিতীয় গুলিটাই রহস্যের কারণ। গুলি লেগেছে। শব্দও পাওয়া গেলো কিন্তু শব্দটা···

ভগাদা বললেন, দ্যাখ চেঁদো। ওদের মিথ্যে বলবো না। শিকার করা এবং ভালো শিকারী হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি ভালো ভালো জিনিস আমি করতে জানি। মিথ্যে ভগা বলবে না। বলব, শেয়ালকেই বাঘ ভেবে····যা ফ্যাক্ট !

গাড়িটা এসে গেলো। গাড়িটা এমনভাবে রাখলো ইমরান যে, হেডলাইটের আলো ওদের গাছে পড়লো। চাঁদু আগে নামলো। ফোঁড়া বিনা নোটিশে ফাটায় পুঁজ-রক্তে ভগাদা মেসসড-আপ হয়েছিলেন। বললেন, বন্দুকটা ধর। ভয় নেই। দুটি গুলিই ফুটে গেছে। বন্দুকটা চাঁদুর হাতে দিয়ে নিজে বাজীরাও এর সাহায্যে নামলেন গাছ থেকে।

চান্দু বললো, হুণ্ডার কাঁহা ? হুণ্ডার না শোনচিতোয়া হুজৌর ?

অজীব ইক আবাজ হুয়া দুসরা গোলিপর। পয়লা গোলি তো মিসহি কিয়েথে। হামলোগোনে হুঁইয়েসে শুনা।

ওদের কথাবার্তায় কান না দিয়ে বিরক্ত চাঁদু নিজের মোটর সাইকেলের দিকে

হেঁটে চললো টর্চ জ্বালিয়ে। শিকারের এই প্রহসনের কিছুক্ষণ আগেই আজ বিকেলে সে যে অন্য এক প্রহসনের মুখ্য চরিত্র হয়েছিলো তাব কথা মনে পড়েই ওর মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। ও ভাবছিলো, মোটরবাইকটা স্টার্ট করে এই পাহাড়ের মালভূমি থেকে সোজা বানীওয়াড়াতে, ওর কোয়ার্টারে গিয়ে থামবে। কিন্তু মোটর সাইকেলের কাছে গিয়েই আঁতকে উঠলো চাঁদু। পেছনের মাডগার্ডটা ফুটো হয়ে গেছে ভগাদার গুলিতে। অথচ আশ্চর্য! টায়ারের কোনো ক্ষতিই হয়নি।

চাঁদু ডাকলো ভগাদা! একটু এদিকে আসুন।

হতচকিত ও মনঃক্ষুণ্ণ বাজীবাও-এর সঙ্গে ভগাদা এদিকে এসে উপস্থিত হলে, বললো চাঁদু, দ্যাখো তোমাব শিকাব। তাইই বলি! অমন মেটালিক সাউণ্ড হলো কেন?

বাজীরাও মুখ হাঁ কবে দাঁড়িয়ে রইলো। হয়তো ভাবছিলো, এই শিকারীকে তাব বাজরা ক্ষেতে না নিয়ে গিয়েই ভালো করেছে। শুয়োরে যে তাকে চিরে দিতো নির্ঘাত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

চাঁদু বললো, তোমার বাহাদুবি আছে! টায়ারটাকে বাঁচিয়ে মাডগার্ডে এমন গুলি কবা জিম কববেটের পক্ষেও সম্ভব হতো না।

ভগাদা হেসে বললেন বোটাক্স বল ছিলো। অব্যর্থ মাব। কেমন মেবেচি বল। বাঘ-সিংহ তো অনেক শিকাবীই মেরেচে আজ অবদি। মোটর সাইকেল মেরেচে কজন?

আমি চললাম।

চাঁদু বললো টা-টা!

কোথায়?

রানীওযাড়ায়।

সে কী! তুই রাতে খেয়ে যাবি। স্নিগ্ধা বলেছে। মা·····

হেমমাসিকে বলবেন যে আমার শরীর ভালো নয়। আজ যেন ক্ষমা করেন। একাদশীর দিন সন্ধেতে তো আসবেনই আপনারা। দেখা হবে।

বলেই চাঁদু মোটর সাইকেল স্টার্ট করলো।

দাঁড়া। চাঁদু দাঁড়া একটু। ভগাদা দৌড়ে গিয়ে চাঁদুর বাইকের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়ালেন একটুক্ষণ। বললেন, তোর কী হয়েছে রে?

কিছু না তো!

স্নিগ্ধার সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছে?

ঝগড়া ? না তো ! ঝগড়া হবে কেন ? তা ছাড়া, কী নিয়ে ?

হয়নি কিছু ? ভালো। কিন্তু মাকে কী বলব ?

বললামই তো। বলবেন যে শরীর ভালো নেই। আপনাদের ওখানে ঢুকলেই আটকে যাবো। আমি আদর ঠেলতে পারি না। তাই আগে চলে যাচ্ছি।

যাবি তো যা। কী আর বলবো ! কিন্তু তুই ইমরানকে নিয়ে যা। তোর বাইকটার দরকার আছে। দশেরার দিন একটু মীর্জাপুরে যাবো।

আপনি তো কাল আসছেনই, তখনই নিয়ে নেবেন।

কাল একটু বিকেল বিকেলই যেতে চাই। তোকে পরশু সকালেই ফেরত দেবো। আশা করি।

তাহলে রাখুন।

বলেই স্টার্ট কবা বাইকটাকে দাঁড় কবিয়ে, নিজে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। বললো, চলি। সাবধানে যেও।

গাড়িতে উঠেই বালিশটাকে পাঠিয়ে দিলো চান্দুকে দিয়ে। বালিশটা বাইকের সিটের উপর পাততে যাচ্ছিলেন ভগাদা। তখন চাঁদু আবার নেমে গিয়ে বললো, চলুন। নিচ অবধি আমিই চালাই। আপনি বন্দুক আর বালিশ নিয়ে গাড়িতে উঠুন। আপনাদের গেটের কাছে আমি গাড়িতে উঠে যাব। বাইক নিয়ে নেবেন আপনি।

তাইই ভালো।

বাজীরাও আর চান্দুও গাড়িতে উঠলো ভগাদার সঙ্গে।

চাঁদু আগে আগে চললো, আস্তে আস্তেই। পেছনে পেছনে ট্যাক্সি।

চান্দু বললো, কাল সকালে গিয়ে দেখতে হবে বাছুরটাব কী হলো শেষ পর্যন্ত। আর মাচার কাঠগুলো খুলে নিয়ে আসব। বাড়ি বানাতে কাজে লেগে যাবে। হ্যাঁ। বাজীরাও বললো। শিকার না হওয়াতে ও হতাশ হয়েছিলে। ভগাদা যে কাঁটাল আর ফোঁড়া আর মোটর সাইকেল মারা শিকারী তা ও আগে কী করে জানাবে।

নিচে নেমে ভগাদাদের বাড়ির একটু আগেই দাঁড় করালো বাইকটাকে চাঁদু। তারপর স্টার্ট বন্ধ করে নামলো। স্নিগ্ধা এখন তার মন ভরে আছে। বড় তেতো লাগছিলো জিভটা। এই উন্মাদ জিনিয়াস বড়লোক পরিবারের মেয়ে স্নিগ্ধার যোগ্য সে নয়। এই পবিবারের সকলেরই ভালোত্ব এবং বিনয়ও বোধহয় একধরনের ঔদ্ধত্যই। অহমিকায় মোড়া।

ট্যাক্সিটা এসে পৌঁছতেই ভগাদা নামলেন। এবং ভগাদা নামতেই চাঁদু উঠে বসলো।

ভগাদা জানালা দিয়ে গলা ভিতরে ঢুকিয়ে বললেন। পরশু সকালে বাড়ি থাকিস। খুব ভোরে যাব তোর বাড়ি। ব্রেকফাস্ট খাবো তোর সঙ্গে। তখন কথা হবে। ওল দ্যা বেস্ট চেঁদো।

ট্যাক্সিটা জোরে চলছিলো। অতখানি পথ চাঁদুকে পৌঁছে ইমরান ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করবে। রাত যদিও বেশি হয়নি।

মাইলখানেক গিয়েই ইমরান গাড়ি দাঁড় করালো। বললো, আপকি লিয়ে পান দেকে রাখখিথী উনহিনে । ম্যায় বিলকুল ভুল বৈঠে।

কওন ?

দিদিজী।

তুমহি খা লো। ম্যায় ঘর যাকর নাহাকে আভভি খানা খাউঙ্গা। ভুখ লাগ্গা হ্যায় জোর।

জর্দা ভি দে কর রাখখীথী। নেহি খাইয়েগা ? সাচমুচ ?

সাচমুচ।

শক্ত গলায় বললো চাঁদু।

তারপর বললো, অব জলদি চালো।

॥ নয় ॥

পুরো দশমীর দিনটা কারখানাতেই কেটে গেলো। কারখানার অফিসে নয়, প্ল্যান্টের ভিতরে। প্লান্টে একটা সীরিয়াস ব্রেকডাউন হয়েছিলো। সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা অবধি কারখানাতেই ছিলো। দশমীর দিনটাতে কী ঘটলো রানীওয়াড়া আর শিউপুরাতে, কিছুরই খোঁজ রাখে না চাঁদু।

খুবই দেরি করে উঠলো ঘুম থেকে। ঘুম ভাঙতেই স্নিগ্ধার মুখটা মনে পড়লো। শরতের রোদের সোনা সব চুরি হয়ে গেলো।

আজ একাদশী।

শারীরিক ক্লান্তি তো ছিলোই তার ওপরে মানসিক ক্লান্তিও কম ছিলো না। পরশু বিকেলে স্নিগ্ধার ব্যবহার চাঁদুকে এমনই এক ধাক্কা দিয়েছিলো যে কালও সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছিলো না ওর। আজও তাই।

আজ শুয়েই শুয়েই দু'কাপ চা খেলো। গতকাল বিকেলে প্যাণ্ডেলে সিঁদুর খেলা। ছেলেদের কোনো কাজ ছিলো না নিশ্চয়ই, সেখানে ভাসানেও চাঁদু যায় না। ফিরে শুনেছে যে বিকেল ছ'টার মধ্যেই ভাসান শেষ হয়ে গেছিলো। নদীও

তো ঢিল মারলেই পড়ে প্যাণ্ডেল থেকে। এত কাছে।

সন্ধেবেলায় গান-বাজনার আসরে এদিনটিতে প্রতি বছরই ও থাকে। কিন্তু অষ্টমীর দিনে ওর বাড়িতেই গান-বাজনা হয়ে গেছে।

ভাবছে, কল্যাণদাকে চিঠি লিখে দেবে একটা যে, শরীর ভালো নেই। তবে এখন লিখবে না। এখন লিখলে কেউ-না-কেউ চলে আসবেনই ওর খোঁজ নিতে। পিড়াপিড়ি করতে। চিঠিটা পাঠাবে সন্ধের মুখে মুখে। গারাজে মোটর-বাইকটাও নেই। ভগাদাও বে-পাত্তা। কথা ছিলো আজ ভোরেই মোটব-সাইকেলটা ফেরত দিয়ে যাবেন। যাই হোক সেটা থাকলে, বাইরে থেকেই বোঝা যায় যে ও বাড়িতে আছে। নেই বলেই বাঁচোয়া। কেউই জানবে না চাঁদু বাড়ি আছে।

সুরজ বললো, নাস্তা ক্যা কিজিয়ে গা ? ওমলেট্ বনা দো ইক্‌ঠো। জাদা হরা-মিরচা ঔর পিঁয়াজ ডালকর। ঔর কফি।

মানসিক ক্লান্তি বা বিষাদ—ঠিক কোনটা তা ও নিজেই জানে না, কিন্তু যাইই হোক তা ওকে যেন অবসন্ন করে দিয়েছে। কিছু খেতে ইচ্ছেই করে না! মুখটা তেতো-তেতো লাগে। বুকটা ঢিপ্-ঢিপ্ করে। রাতে ঘুম হয় না। এমন অসুখে সে জীবনে পড়েনি। মাত্র পাঁচটা দিন। পঞ্চমীর দিন সকালে ওদের আনতে গেছিলো মোগলসরাই স্টেশনে। আর আজ একাদশী। কথা আছে কোজাগরী পূর্ণিমাব পরদিনই সকলে চলে যাবেন ওঁরা। যে পাঁচটি দিন কেটে গেছে তা খুবই ভালোই গেছে। কিন্তু যে পাঁচটি দিন বাকি আছে তার কথা ভেবেই ওর আতঙ্ক হচ্ছে। কেন যে মাসিমণি ওঁদের পাঠালেন! কেনই যে স্নিগ্ধার সঙ্গে ওর দেখা হলো! ওব সমস্ত জীবনটাই যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে তার পর থেকে। চাঁদুর মতো মোটামুটি শিক্ষিত, আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন ছেলে যে মানসিকতাকে ভর করে "অঞ্জলি" দেওয়াতে বিশ্বাস করেনি, করেনি কোনো রিচুয়ালসে। তেমনই করেনি 'প্রেম'-এও। 'প্রেম'কেও ও একধরনের "ন্যাকামি" বলেই জেনে এসেছিলো এতোদিন। ভেবেছিলো, এও একরকমের সখের খেলা, স্বেচ্ছানির্ভর। হঠাৎ-আসা-বানের জলে, "visiting-sea"-র জোয়ারে যে এমন ভাবে ভেসে যাবে ও নিজেই দুঃস্বপ্নেও তা ভাবেনি। প্রেম চেষ্টা করে করা যায় না, প্রেম হয়ে যায়। দগ্ধ শলাকার মতো মানুষকে তা বিদ্ধ করে। এখন তা ও জানে। স্নিগ্ধার কালকের ব্যবহার সত্যিই ওকে আহত করেছে। প্রেম তো কোনো মৌল অনুভূতি নয়. প্রীতি, সখ্য, দয়া, করুণা, অনুকম্পা, ভালোলাগা এই সবই যে কোন্ মুহূর্তে গড়িয়ে যায় প্রেমে তা কী কেউ বলতে পারেন ? কাব্য-সাহিত্যে তো

সেরকমই পড়েছে ! তাই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বই-পড়া অভিজ্ঞতা কিছুতেই মেলাতে পারছে না। প্রিয়জনের দুঃখেও সমবেদনা জানালে যে তাকে ছোট করা হয় তা ওর জানা ছিলো না আগে। অবশ্য সেই অর্থে স্নিগ্ধাই ওর জীবনে প্রথম অনাত্মীয়া নারী, যাকে সে প্রিয়জন বলে প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই মনে করতে শুরু করেছে।

কাল রাতে জ্যোৎস্নায় নদীর পাড়ে অনেকক্ষণ হেঁটে বাড়ি ফেরার পরই সুরজকে অভ্যেসমতো জিজ্ঞেস করেছিলো ও, "কই খত" ?

এক। কালহি আয়েথে।

উত্তরে বলেছিলো সুরজ।

ভারী চিঠিটাকে নিয়ে তখন বিছানার মাথার দিকে যেখানে বই আছে থরে থরে সাজানো, সেখানেই রেখে দিয়েছিলো। তখন আর পড়ার মতো অবস্থা ছিলো না। শুয়ে শুয়েই মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা টানলো আঙুল দিয়ে। শ্যামলদার চিঠি। এটা আগের চিঠিটা। গতরাতের চিঠিটি একটি ইনল্যাণ্ড লেটার ছিলো। মনে আছে ওর।

শ্যামলদার চিঠিটা দেখেই একবার মনে হলো এখুনি ফ্রাঙ্কফুর্টে উত্তর দিয়ে দেয় জানিয়ে যে চাকরিটা ও চায়। চলে যাবে পশ্চিম-জার্মানিতেই। এখানে আর থাকবেই না। মা-নেই, বাবা নেই, ভাই নেই বোন নেই তবুও ও এমনই একটি মেয়ের খোঁজ পেয়েছিলো, এমন একটি পরিবারের, যে মা-বাবার পর নতুন পিছুটান-এর মতো কিছু গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো মনের মধ্যে ক'দিন হলো। ওর কোনো শিকড় নেই। শিকড় গভীরে প্রবেশ করছিলো মনে ধীরে ধীরে। ভাবলো, এক্ষুনিই উত্তর দেয় শ্যামলদাকে। পরক্ষণেই ভাবলো, একজন তাকে আঘাত দিয়েছে তা ঠিক। কিন্তু তার নিজের দেশ, দেশের এই হাইডাল-প্রোজেক্ট, এতো মানুষজনের ভালোবাসা, বাজীরাও, মাল্‌তি পরশু দেখা নতুন চান্দু এরাও তো তার কম কাছে মানুষ নয় ! নিজের দেশ ছেড়ে, স্বদেশের সমস্যার ভয়ে ভীত হয়ে বিদেশে গিয়ে ভালো-থাকা ভালো-পরার চেয়ে দেশে থেকে সকলের সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে সুখে-দুঃখে দেশের ভাগীদার হয়ে থাকাটাই বা কম ভালো কী ! পালিয়ে যাবার মনোবৃত্তি তার নেই। সংসার, সমাজ, সমস্যা থেকে তো নয়ই ; এমনকি স্নিগ্ধার দেওয়া দুঃখের হাত থেকেও নয়।

আবারও হাত দিলো মাথার কাছে। কালকে-আসা চিঠির বদলে হাত পড়লো ক্ষণিকাতে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা। বইটি ওর বাবার। উত্তরাধিকারসূত্রে

পাওয়া। ইতালির ভেনিসিয়ান চামড়ার মোড়কে মোড়া। মন খারাপ হলেই ও 'ক্ষণিকা' পড়ে। ওর সমবয়সী অনেকেই ক্ষণিকার নামই শোনেনি। সেটা তাদেরই দুর্ভাগ্য বলে মনে করে চাঁদু। রবীন্দ্রনাথের নয়।

হাতে তুলতেই যে পাতা খুলে গেলো সে পাতাতে চোখ পড়লো :

"ফুরায় যা দেরে ফুরাতে/ ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনে কো কুড়াতে/ বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে,/ জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,/ পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে/ যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে ৷৷"

না, এই 'উদবোধন' নয়, ও খুঁজতে লাগলো 'বোঝাপড়া'। বেরিয়েও পড়লো পাতা একটু উল্টোতেই।

"আকাশ তবু সুনীল থাকে
মধুর ঠেকে ভোরের আলো--
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

আরও একটি প্রিয় কবিতা আছে চাঁদুর। পাতা ওল্টালো। 'ভীরুতা'। পড়েছে বহুবার কিন্তু আজকের মতো তাৎপর্যময় তা কখনও হয়ে ওঠেনি আগে।

"ইচ্ছা করে নীরব হয়ে রহিব তোর কাছে, সাহস নাহি পাই/ মুখের পরে বুকের কথা উথলে ওঠে পাছে,/ অনেক কথা তাই/শুনিয়ে দিয়ে যাই—/ কথার আড়ে আড়াল থাকে মনের কথাটাই/ তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু জাগিয়ে তুলি ভাই,/ আপন ব্যথাটাই।"

সুরজ বললো, নাস্তা লগা রহা হ্যায়।

চাঁদু তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেলো হাতমুখ ধুতে। আজ এখন চান করবে না। আলসেমি করবে আজ। ভাববে একা একা। ভালো গান শুনবে। পড়তেও পারে কিছু। অনেকই না-পড়া বই জমে গেছে। অন্য সবাই যা করতে

ভালোবাসে তা করতে চাঁদুর ভালো লাগে না। সে-কারণে তিরিশ বছরের চাঁদুকে ওর সমবয়সীদের অনেকেই এখানে 'জ্যাঠা' বলে আড়ালে। সে তারা যা খুশি বলুক। ওর যায় আসে না। ছুটির দিনগুলোতে বিকেলে টেনিস খেলে ক্লাবে। ক্লাবেই চান করে। তার পর দু-তিনটে হুইস্কি খেয়ে বাড়ি চলে আসে।

বাথরুম থেকে ফিরে, খাওয়ার টেবলে বসলো। এখান থেকেও দেখা যায় শাল জঙ্গল আর পাহাড়। নদী দেখা যায় না। নদী দেখা যায় শুধুই শোওয়ার ঘর থেকে। এক এক ঋতুতে এক এক রূপ নদীরও। বনেরই মতো। বাদামী পাল তুলে মন্থর গতিতে নৌকো ভেসে যায় চুনারের দিকে। শুয়ে শুয়ে নদীকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে অথবা নিজেকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে চলে যেখানে খুশি।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সুরজকে বললো চাঁদু যে শোবার ঘরে মাথার কাছে রাখা কালকের চিঠিটা নিয়ে আসতে। কাল প্রত্যেকেরই ছুটি ছিলো। দশেরার জন্যে। কিন্তু সুরজ চাঁদু ছিলো না বলে বেরোতে পারেনি। তাই সুরজ বলেছে আজ দুপুরে খিচুড়ি রেঁধে রেখে যাবে। মুগ ডালের আর আলুর ঝাল চচ্চড়ি। কষামাংসও করে দেবে। রেখে দেবে কিছুটা। শুধু গরম করে নিয়ে রাতের বেলা খেয়ে নিতে হবে। দুপুরের খাওয়ার পরই যাবে ও।

চিঠিটা আনতেই দেখলো মাসিমণির চিঠি। কফিতে আরেক চুমুক দিয়ে বিরক্ত মুখে ও চিঠিটি খুললো। মনে পড়ে গেলো যে, স্নিগ্ধা চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাসের গলায় বলেছিলো, "মাসিমণি! ইনক্রেডিবল! অফ ওল পার্সনস্।" কথাগুলো কানে তখনও গরম হয়ে লেগেছিলো চাঁদুর।

চিঠিটি খুলেই পড়তে লাগলো। এবং কয়েক লাইন পড়েই কফিতে চুমুক দিতে ভুলে গেলো ও।

কলিকাতা
ষষ্ঠী

স্নেহের বাবা চাঁদু,

হেমনলিনী, দুই পুত্র এবং পুত্রবধূদিগের সহিত স-কন্যা গতকল্য মোগলসরাইতে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে এবং তুমি যে তাহাদিগকে স্টেশনেই অভ্যর্থনা করিয়াছো এবং তোমার রূপ গুণ এবং ব্যবহারে হেম এবং পরিবারস্থ সকলেই যে মুগ্ধ তাহা আজই প্রত্যুষে তোমাদের কোম্পানীর ম্যানিজিং ডিরেক্টর আড়ুয়ালপাল্‌কার সাহেবের বাংলো হইতে ফোনে হেমনলিনীর ছোট ছেলে আমাকে জানাইয়াছে।

এই চিঠি তুমি পাইতে পাইতে বিজয়া-দশমী হইয়া যাইবে। তুমি আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। হেমনলিনীর ঠিকানা না-জানায় আমি তোমারই ঠিকানায় উঁহাদের আলাদা পত্র লিখিতেছি। কিন্তু তোমাকে আগে লিখিবার প্রয়োজন ঘটায় তোমাকে টেলিফোন ছাড়িবামাত্রই এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি।

বাবা, চাঁদু। হেমনলিনীকে আমি জানি । কিন্তু উহার পুত্রকন্যাদিগকে দেখিয়াছি মাত্র। তাহার বেশি বিশেষ কিছুই জানি না। ইদানীংকালের পুত্র-কন্যারা সব কংস হইয়াছে। আমারটিও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু হেম-এর ছোট পুত্রটি যে আমার সহিত এই রূপ তঞ্চকতা করিবে তাহা আমার বিশ্বাসেরও অতীত ছিলো। তুমি জানো যে উহাদের সহিত আমার এমনিতে কোনোই যোগাযোগ নাই। উহারা তেমন মিশুকেতো নহেনই, বরং দাম্ভিক এবং উন্নাসিক বলিয়া আত্মীয়-পরিজনেব নিকট প্রত্যেকেই পরিচিত। আমার বড় ননদ শৈলবালা তো প্রথম হার্ট-অ্যাটাকেই মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তা তুমি শুনিয়া থাকিবে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার শ্বশুরকুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও শিথিল হইয়া আসে। তাই উহাদের নিয়মিত কোনো খবরাখবর লওয়া সম্ভব হয় নাই। যোগাযোগও ছিলো না।

উঃ। মনে মনে বললো অধৈর্য চাঁদু। বৃদ্ধারা যে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কত অবান্তর কথাই চিঠিতে লিখতে পারেন। ভগাদা তঞ্চকতাটা কী করলেন সেটা তো দু' কথাতেই সারতে পারতেন ?

কফিও ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। সুরজকে আরেক কাপ কফি দিতে বলে ও এসে বসার ঘরের ইজিচেয়ারে বসলো রাতের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই।

হেমনলিনীরা রওয়ানা হইবার দিন দশেক পূর্বে রমেশ (ভগা) আমার নিকট আসিয়াছিলো এবং তুমি মোটরবাইকে যাতায়াত করো তাহা শুনিয়াই সেই লাল ফুল-হাতা শার্ট পরিয়া যাইতে তোমাকে অনুরোধ করিবার জন্যে আমাকে লিখিয়াছিলো। সেই আমাকে স্নিগ্ধার বিবাহ এবং ডিভোর্সের কথা সবিস্তারে বলিয়াছিলো। এবং তাহারই নির্দেশমতো তোমাকে পত্র দ্বারা সমস্ত জানাইয়াছিলাম। নিজের একমাত্র অবিবাহিতা ভগিনী সম্বন্ধে কোনো ভদ্রসন্তান যে মাতৃস্থানীয়া কাহারও সহিত এইরূপ তঞ্চকতা করিতে পারে তাহা আমার ভাবনারও অতীত ছিলো। অথচ সে যে তঞ্চকতা করিয়াছিলো, তাহা যখন স্বীকার করিয়া কিয়ৎক্ষণপূর্বে আমার নিকট পরম বিনয়ের সহিত ক্ষমা চাহিলো তখন কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত সুবোধ বলিয়াই মনে হইলো। জানি না, তাহা ভ্রম কী না !

রমেশ (ভগা) ফোনে কহিলো, কিরণ মাসী, আপনি রাগ করবেন না। আমি সমস্ত ম্যানেজ করে দেব। ছেলেবেলা থেকে সকলকেই "ভোগ্‌লা" দেওয়াই আমার বদ্‌রোগ বলেই মা আমাব নাম রেখেছিলেন "ভগা"।"

বুঝিয়া দ্যাখো বাবা চাঁদু! "ভোগ্‌লা" দিয়া দিয়া যাহার নামই হইয়াছে "ভগা" তাহাকে আমা হেন অসহায় বিধবা কী প্রকারে সামলাইবে? তোমাদের কোম্পানীর বড সাহেব আড়ুয়াল্‌পালকার যদি তাহার এতোই পরিচিত হইবে তাহা হইলে ভগা তো তাহাকেই লিখিতে পারিত! আমার দ্বাবা তোমাকে উহাদের থাকিবার ব্যবস্থার জন্যে বিব্রত করাইবার কোনোই দবকার ছিলো না। উহারা বড়লোক আছে তো আছে তাহাতে আমার কি? আমি তো তাহাদের কাছে কোনো কৃপা ভিক্ষা করিতেছি না! তাই কিছুতেই ভাবিয়া পাহিতেছি না, এইভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের কোনো প্রয়োজনও তাহার কেন হইল। এ প্রসঙ্গে একটি সন্দেহ আমার মনে জাগিয়াছে। কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি না। উহারা কলিকাতায় ফিরিলে হেমনলিনীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলিয়াই তা তোমাকে জানাইব। বডই সমস্যায় পড়িয়াছি।

চতুর্থীর দিন হেমনলিনীরা কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাহার পূর্ব দিন অর্থাৎ তৃতীয়ার দিন পরিবারস্থ সকলকেই লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। যে যাহাই বলুক তাহাদের সামনাসামনি দেখিয়া আমার তো উহাদের দাম্ভিক বা উন্নাসিক বলিয়া মনে হয় নাই। হেমনলিনীর মেয়ে স্নিগ্ধাকে আমার বড়ই মনে ধরিয়াছিলো। দিদি-জামাইবাবু আজ থাকিলে অমন কোনো কন্যাকেই তোমার বধূরূপে ঘরে আনিতেন। রমেশকে (ভগা, কী হতচ্ছাড়া নাম!) দেখিয়াও সে যে এই প্রকার তঞ্চকতা করিতে পারে তাহা একবারও মনে হয় নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ভদ্র, বিনয়ী পুত্র। বিদেশে থাকে, এতো উচ্চশিক্ষিত তা দেখিয়া বুঝিবার জোটি নাই। স্নিগ্ধার পবিত্র, স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকাইয়া আমাব আর তাহার মা অথবা ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে তাহার ডিভোর্স লইয়া আলোচনা করিবার ন্যায় নিষ্ঠুরতা হয় নাই।

এক্ষণে তুমি আমাকে যদি নিজগুণে মার্জনা করো তাহা হইলে বিবেকের কাছে কিঞ্চিৎ হালকা বোধ করিব। তুমি যদি কোনো অসাবধান মুহূর্তে স্নিগ্ধাকে ডিভোর্সের কথা এবং তাহা তুমি আমার নিকট হইতেই শুনিয়াছো তাহা বলিয়া ফেলো তাহা হইলে (এবং ডিভোর্সের কথা প্রকৃতই মিথ্যা হইলে: অবশ্য একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কোনটি ভোগ্‌লা আর কোনটি নহে তাহা তঞ্চকতার দেবদূত ভগাচন্দ্র স্বয়ংই জানিবেন) আমার ইহজীবনে হেমনলিনীর নিকট আর

মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

আর অধিক কি লিখিব ? পুনশ্চ তুমি আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।—ইতি আশীর্বাদিকা মাসীমণি।

এর চেয়েও "অধিক" আর কিছু সত্যিই লেখার থাকতেও পারতো না মাসীমণির। চাঁদুর কেবলই নিধুবাবুর সেই টপ্পাটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো।

"মরমে মরম যাতনা, ভালোবাসার অযতনে/ আমি একা যে একাজে মজে, ওগো বাজের অধিক বাজে প্রাণে ॥

মরমে মরম যাতনা ভালোবাসার অযতনে..."

এবারে পুজোয় অনেক কিছুই ঘটলো। অনেক নতুন সুখের অনুভূতি। এবং দুঃখেরও। কিন্তু রাইট-অ্যান্ড-লেফ্‌ট "ভোগ্‌লা" দিয়ে-যাওয়া ভগাদার দর্শন পাওয়াটাই বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ছুটি নিয়েছিলো পঞ্চমী পর্যন্ত। কালকেই সকালে আড়ুয়ালপালকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দুটি ব্যাপারের ফয়সালা করতে হবে। প্রথম হচ্ছে, ছুটি ক্যানসেল করা। মিছিমিছি "ভোগলা অ্যাণ্ড কোম্পানির" জন্যে সারা বছরের ছুটির অনেকখানি এরকম ভাবে নষ্ট করতে রাজি নয় ও। দ্বিতীয়ত, বড়সাহেবের কাছ থেকে সত্যিই খোঁজ নিতে হবে ভগাদা বড়সাহেবকে আদৌ চেনেন কী না ! ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বর কথা তো পরে !

বিকেলে যখন ঘুম থেকে উঠলো তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। একাদশীর চাঁদ উঠেছে শলবনের মাথায়। বারান্দায় এবং জানালা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েছে। সারা বাড়ির কোথাওই আলো জ্বলছে না। সুরজ চলে গেছে সেই সকালেই। নিষ্প্রদীপ বাড়িতে ভিতরে থেকে বাইরের চন্দ্রালোকিত রাতকে ভারী ভালো দেখাচ্ছে। এবারে পুজোর আগে এদিকে বেশ ভালো বর্ষা হয়েছিলো। পুজোও তাড়াতাড়িই পড়েছিলো। দশমীর জ্যোৎস্নাকেই মনে হচ্ছে পূর্ণিমার বলে।

এমন সময় বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ পেলো। বিরক্ত হলো চাঁদু। বাড়িতে থেকে যে একটু নিরিবিলি একটা দিন কাটাবে তারও কি উপায় নেই। মানুষের প্রাইভেসি এমন করে ডিসটার্ব করা হিতার্থীদেরও উচিত নয়।

বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে ওর বিরক্ত মন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো এই কথা ভেবে যে যদি স্নিগ্ধা এসে থাকে ? যদি কালকের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চায় ওর কাছে ? তখন কী করবে চাঁদু ? কী করে প্রেম জানাতে হয় তা তো ও

জানে না। এমন একটা সামান্য কাজ যে এতো কঠিন তা কোনোদিন ভাবতেও পারেনি।

দরজা খুললো, ঘরের আলো জ্বালিয়ে। মনের আলোও জ্বালিয়ে। অনেক আশায়। কিন্তু দেখলো স্নিগ্ধা নয়। কল্যাণদা। বললেন, তোমার ফোন কি খারাপ? সুরজের কাছে শরীর খারাপের কথা শোনার পর থেকে অনেকবার ফোন করেছি। পেলাম না। তাই ফাংশান আরম্ভ হবার আগে নিজেই এলাম খোঁজ নিতে।

তেমন কিছু খারাপ নয়। এই লাগাতার ; মানে ভগাদারা আসার পর থেকেই, পঞ্চমীর দিন থেকেই চলেছে তো! শরীর-মন দুইই ক্লান্ত। তাই···। ফোনের প্লাগ খুলে রেখেছিলাম।

ওঃ। তাইই···।

তা, তুমি যেন কোনো কারণে তোমার আত্মীয়দের ওপরে·একটু বিরক্ত হয়েছো মনে হচ্ছে চাঁদু। অমন একটি সুন্দর পরিবার, মানে শারীরিক এবং মানসিক সৌন্দর্যেরও ; আমি তো বেশি দেখিনি। কোনো কারণে কোনো ভুল বোঝাবুঝি···

না না, সেসব কিছুই নয় কল্যাণদা। আমি ফীজক্যালি টায়ার্ড তো। কাল সারাদিন তো কালিঝুলি মেখে চোদ্দ ঘণ্টা কারখানাতেই কাটলো। পরশু রাতে বাজীরাও-এর সঙ্গে হুণ্ডার শিকারে গেছিলেন ভগাদা। সন্নিসিদের আশ্রমের বাছুর নিয়েছিলেন। আমাকেও সঙ্গী করেছিলেন।

তা, হলো শিকার?

হলো। মানে শিকার হলো। তবে হুণ্ডার নয়।

কী তবে? শোনচিতোয়া?

না। একটি ফোঁড়া। অন্যটি আমার মোটরসাইকেল। পেছনের মাডগার্ডটি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে।

হেসে ফেললেন কল্যাণদা। সঙ্গে চাঁদুও হাসতে লাগলো।

কল্যাণদা হাতে হাসতে বললেন, ফোঁড়াটা কার?

সেটা নিজেরই। ফোঁড়া শিকারটা কো-ইন্সিডেন্টাল। পরে বলব আপনাকে গল্প।

গান আজ সত্যিই গাইবে না?

না। কল্যাণদা। মন না চাইলে, গান গাইতে পারি না।

কারোরই পারা উচিত নয়।

বলে, কল্যাণদা চলে গেলেন। গাড়ির টেইল-লাইট দুটো মিলিয়ে গেলো।

চাঁদু নবীন যুবক। আধুনিক। ধর্ম, পুজো-আচ্চা এসবে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না ঈশ্বরেও। তবে এই বিজয়ার দিনে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। বাবা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে প্রতিদিন অঞ্জলি দিতেন। মা পরতেন এ-বেলা ও-বেলা নতুন শাড়ি। অঞ্জলি দেওয়া ছাড়াও সন্ধেবেলা যেতেন পাড়ার পুজোর প্যাণ্ডেলে সন্ধ্যারতি দেখতে। বাবা-মায়েরা যা করতেন তা চাঁদু কেন, এখন অনেকেই করে না। না-করাটাই ফ্যাসান ; আধুনিকতা বলেই করে না ওরা। সকলেই। হঠাৎই চাঁদুর মনে হলো বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-মেধায় ওর মা-বাবা কি ওর থেকে অনেকই নিকৃষ্ট ছিলেন ? আধুনিকতা বলতে যা-কিছুই বোঝায় বুঝিয়েছে চিরদিন তার প্রায় সব কিছুই তো তার বাবার এবং মায়ের মধ্যেও ছিলো। চাঁদুর মাসীমণি মায়ের একমাত্র বোন হলেও মায়ের সঙ্গে তাঁর অনেক এবং অনেকই রকম তফাত ছিলো। তবে কেন তাঁরা অন্যরকম ছিলেন এ নিয়ে তেমন করে ভাবেনি কখনও। চাঁদুদের এই অন্যরকম হওয়াটা কতখানি হুজুগ-নির্ভর এবং কতখানি যুক্তিনির্ভর তা কখনও বিচার করে দেখেনি নিজেই।

দরজাটা বন্ধ করে বসবার ঘরের আলো নিবিয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে এমন সময় আবারও একটি গাড়ির শব্দ পেলো। এবং শোওয়ার ঘরে পৌঁছবার দশ মিনিট পরই আবার কলিং-বেল বাজলো।

আবারও আলো জ্বেলে দরজা খুলে দেখলো, পগাদা। একা।

কী হে চাঁদু ? তোমার নাকি শরীর খারাপ। শুনলাম। প্যাণ্ডেলে গিয়ে। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

আপনাকে কে বললো ?

চাঁদু শুধলো।

আমাকে বললেন, আড়ুয়ালপাল্‌কার সাহেব।

ওঁর তো জানার কথা নয়।

সন্দিগ্ধ গলায় বললো চাঁদু।

কল্যাণবাবু ওঁকে প্যাণ্ডেলেই বলেছেন। প্যাণ্ডেলে নামবার মুখে দেখা হলো ওঁর সঙ্গে। মা তাই বললেন, তোমার খবর নিয়ে আসতে।

আড়ুয়ালপালকার সাহেবের সঙ্গে আপনার আগে পরিচয় ছিলো ?

ছিলো বৈকি। আড়ুয়ালপালকারের বাবা ছিলেন আমার বাবার জুনিয়র। বাবার সুপ্রীম কোর্ট এবং দিল্লি হাইকোর্টের সব প্র্যাকটিসও উনিই পেয়েছিলেন বাবার মৃত্যুর পর। এখনও প্র্যাকটিস করেন। খুব ভালো প্র্যাকটিস। বাঙালীর

ছেলে হলে, আমারই মতো ; বাবার পয়সায় বসে খেতে পারতো। ওরা আর আমরা একই পরিবারের লোকের মতো।

আজ ওঁর ওখানেই ডিনারের নেমন্তন্ন। তাইই চলে গেলেন বন্দোবস্ত করতে। ওঁর স্ত্রী লতাও তাই আসেননি প্যাগুলে।

তাই ?

একটু আহত হলো চাঁদু। বড় সাহেব ওকে বললেনই না। মানে, ডিনারে।

কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

সকলেই যাচ্ছেন ? চাঁদু শুধলো।

সকলে, মানে, স্নিগ্ধা ছাড়া। আর ভগাটা তো কাল সকালবেলাতেই মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে। বলে গেছে আজ রাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে যাবে। নইলে নয়। পরে আরেকদিন যাবে। মা এবং ওরা তো প্যাগুলেই। তোমার জ্বর কত ?

জ্বর হয়নি। এমনিই ! আজকের দিনটা রেস্ট নিচ্ছিলাম। ভাবছি কাল থেকে অফিস জয়েন করব। এখন তো আপনাদের পুরো সার্কিটই পরিচিত হয়ে গেছে। কোনো অসুবিধা হবে না আমি না থাকলেও। তাছাড়া আগে যদি জানতাম যে বড়সাহেবই আপনাদের বন্ধু তাহলে মাসিমণিকে···

পগাদা শব্দ করে হাসলেন। বললেন তুমি কি আমাদের বন্ধু নও। তুমি তো বন্ধুর চেয়েও অনেক বেশি। তুমি তো আমাদের আত্মীয়।

চাঁদুর খুবই ইচ্ছে করছিলো যে জিজ্ঞেস করে স্নিগ্ধা কেন যাবে না আড়ুয়ালপাল্‌কার সাহেবের বাড়ি। কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না। পারলো না।

কিছু খাবেন ? একটা হুইস্কি ?

না চাঁদু। থাক। মণ্ডপে যাবো তো ! ভেবেছিলাম তোমার গান শুনতে পাবো। হলো না। ভবিষ্যতে আশা করি শোনাবে। আর হুইস্কি তো নেমন্তন্ন বাড়িতেই খাবো।

ভগাদা চলে গেলেন। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, ওঃ। ভুলেই গেছিলাম। স্নিগ্ধা একটি চিঠি দিয়েছে তোমাকে। আসার কারণ সেটাও।

চাঁদু ভাবছিলো, স্নিগ্ধার কি শরীর-টরির খারাপ হলো ?

ভিতরে যাবে দরজা বন্ধ করেছে, ঠিক এমনি সময়ে সাইকেল-রিক্সা চড়ে চৌবেজী এসে বললেন, "চাঁদুবাবু, খবর জানেন কিছু ? বিন্দিয়া পালিয়ে গেছে। অথবা চুরি হয়ে গেছে। বিকেল চারটেতে ঝাঁ-জীর স্ত্রী আর ঝাঁ-জী হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়েই বাড়ি থেকে বিন্দিয়া উধাও।

কাজের লোক ছিলো না বাড়িতে ?

আজ সে ছুটি নিয়েছে।

পাশের বাড়ির হোসেন সাহেবের বাড়ির উল্টোদিকের তেওয়ারীজীর বাড়িরও কেউই দেখেনি বিন্দিয়াকে বাইরে থেকে।

তবে ? টাউনশিপের গেটের দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

আরে ! আড়ুয়াল্‌পালকার সাহেব নিজে এস· পি· এবং আই· জি-কেও ফোন করেছেন। গেটের সিকিউরিটির লোকেরা বলেছে যে ঐ সময় অচেনা লোক বলতে একজন মৌলবী সাহেব আর তার বোর্‌খা-পরা বিবি মোটর-সাইকেলে করে গেছেন। তবে মৌলবী মাঝ-বয়সী। দাড়ি কাঁচা-পাকা। মোটসাইকেলও ধূলিধূসরিত।

হোসেন সাহেবকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। উনি বললেন, ঐ মৌলবী তো ওঁর রিস্তেদার। সকাল নটার সময় এসেছিলেন ঔরঙ্গাবাদ থেকে। আমার ছোট ভায়রা উনি। শালীকে নিয়ে গেলেন। শালী এসেছিলেন সাতদিন আগে।

বলেই, বললেন, আপনার মোটর-সাইকেলটা কোথায় ?

চাঁদু বুঝলো, এতক্ষণে, চৌবেজীর আসার আসল কারণ।

তারপর হেসে বললো, আমার মোটর-সাইকেল পরশু রাত থেকেই ভগাবাবুর কাছে। উনি মীর্জাপুর না কোথায় যেন যাবেন। কালকেই ফিরিয়ে দেবেন বলেছেন বাইক। আমার সঙ্গে বিন্দিয়ার পালানোর কোনো যোগাযোগ আছে বলে যদি সন্দেহ করেন আপনারা, আমার মোটর-বাইকটা গারাজে নেই বলেই, তাহলে আড়ুয়ালপালকার সাহেবকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। সত্যি বলছি কী মিথ্যা !

উনি জানবেন কী করে ?

চৌবেজী বললেন সন্দিগ্ধ গলায়।

চাঁদু বললো, জানবেন, কারণ ঐ ভগাবাবু, আমার রিস্তেদার ; যিনি মোটর-সাইকেলটি নিয়েছেন, তিনি বড়সাহেবরও বন্ধু।

সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে গেলো। চৌবেজী বললেন, ছোড়িয়ে চাঁদুবাবু। আপ্ ক্যা পাগলপন্থী বাঁতে করতে হেঁ। বিন্দিয়া কি মামলেমে আপকি ক্যা আতা-যাতা হ্যায় ?

বলেই, রিক্সা ঘুরিয়ে বললেন, আচ্ছা ! অব্ ম্যায় চলে।

সাইকেল-রিক্সাটা বড় রাস্তার দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছিলো। চাঁদু ভাবছিলো, মেয়েটাকে সত্যি-সত্যিই কোনো গুণ্ডা-বদমাসে নিয়ে গেলো হয়তো ! যেহেতু

বিন্দিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না সেইহেতু রানীওয়াড়ার উচ্চবর্ণের আগ্-মার্কা মানুষেরা মেয়েটির বিপদের কথা একবারও চিন্তা না করে শুধু ভাবছেন বিন্দিয়া বোধহয় ভরত যাদবের কাছেই পালিয়ে গেলো।

মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগলো। টেলিফোনটার প্লাগটা লাগালো চাঁদু। লাগিয়ে, শোওয়ার ঘর থেকে ঝাঁজীকে ফোন করলো। ঝাঁজী'র ঘরে অনেক লোকজনের গলা শুনতে পাচ্ছিলো ও। ঝাঁজী এসে ফোন ধরলেন। বললেন, 'হ্যাঁ চাঁদু কথাটা সত্যি ! তোমার ভাবীজীকে নিয়েই মুশকিলে পড়েছি। বড়ই কান্নাকাটি করছেন।

চাঁদু বললো, আজ রাতটা ধৈর্য ধরে থাকতে বলুন। কাল সকালেই খবর পাবেন। বড়সাহেব নিজে ফোন করেছেন এস· পি· এবং আই· জি·-কেও। কোনো চিন্তা করবেন না। আমি কোনো খবর পেলেই জানাবো। আমি নিজেও যাব অফিস যাওয়ার পথে।

তারপর পগাদার আড়ুয়ালপালকার সাহেবের দোস্তির কথাটা সত্যি না মিথ্যে তা জানবার খুব ইচ্ছে হলো ওর। মাসিমণির চিঠি পাওয়ার পর থেকেই নানারকম ঘটনা-দুর্ঘটনা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে চলেছে। এরা নিজেরা দুনম্বরী মানুষ কী না তাও জানা দররকার। কিন্তু বড়সাহেবকে ফোন না করে স্নিগ্ধার চিঠিটাই আগে খুললো।

স্নিগ্ধা লিখেছে,

৩-১০

চাঁদু,

আমার পরশুর ব্যবহারের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনি নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। আমিও আপনাকে কষ্ট দিয়ে এই দুদিন কষ্ট কম পাইনি। ইমরান্-এর কাছে শুনলাম, আপনার জন্যে দেওয়া পানও আপনি খাননি। রাগ তাহলে বিলক্ষণ হয়েছে।

আড়ুয়ালপালকারেরা আজ বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন অথচ আমাকে করেননি। শুনলাম যে, আপনাকেও করেননি। অথচ আমরা সকলেই বলতে গেলে রানীওয়াড়াতে আপনারই অতিথি। এটা পরোক্ষে আপনাকে অপমান করা। এতে আমার মনে একটি সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। তা এইই যে, আমাকে এবং আপনাকে ওঁদের কোনো চক্রান্তের শিকার করতে চলেছেন ওঁরা সকলে মিলে। চক্রান্তের আভাস এখানে আসার জন্যে ট্রেনে চাপার পর থেকেই অনুমান করছিলাম। আজ সেই সন্দেহই আমার বদ্ধমূল হয়েছে।

আমি বাড়িতে একা আছি। আপনি যদি কোনোমতে চলে আসতে পারেন তবে নিরিবিলিতে কথা বলতে পারি। ওঁরা ফিরতে রাতও হবে। আপনাকে আমার কিছু বলার আছে। হয়তো শোনারও।

আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন সেদিনের ব্যবহারের জন্যে, তবেই আসবেন।

ইতি স্নিগ্ধা।

হাতের লেখাটি মেয়েলি। কিন্তু গোটা গোটা ঋজু অক্ষর। লেখিকার ব্যক্তিত্ব চিঠির মধ্যে ফুটে উঠেছে। আরেকবার পড়লো চিঠিটি।

কোম্পানির ট্রান্সপোর্ট ডিপোতে ফোন করে দিলো একটা গাড়ির জন্যে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে চান করে নিয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই বসবার ঘরে গিয়ে দেখলো গাড়ি এসে গেছে। কোয়ার্টারের বাইরের দরজা লক্ করে গাড়ির পেছনের সিটে নিজেকে ছোট্ট করে গুটিয়ে নিয়েই বসলো। কারণ শিউপুরার পথ গেছে প্লাগুলের একেবারে সামনে দিয়েই। কেউ দেখে ফেলে আটকে দিলেই মুশকিল।

গাড়িটা গেট-এর ভিতরেই ঢোকাতে বললো চাঁদু। দারোয়ানেরা ওকে দেখে গেট খুলে দিলো। স্নিগ্ধা বোধহয় ভিতরে ছিলো। গাড়ির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বারান্দাতে এলো।

বললো, আসুন! আসুন! কী সৌভাগ্য আমার!

চাঁদু মনে মনে বললো, সৌভাগ্য যে কার তা কে জানে!

চলুন গিয়ে ভেতরের বারান্দায় বসি। সুন্দর চাঁদের আলো। বাইরের বারান্দাতে অন্ধকার। শেষ রাতে আলো হবে এ বারান্দা।

ভেতরে থেকেই, কাজের মেয়েটিকে বারান্দা থেকে হ্যারিক্যানটা সরিয়ে নিতে বললো স্নিগ্ধা। বললো, কলকাতায় তো এমন চাঁদের আলো দেখার সুযোগ হয় না। মনটাও কেমন নরম হয়ে আসে।

তারপর বাইরে গিয়ে দ্বারোয়ানদের অনুরোধ করলো দুটি ইজিচেয়ার ভেতরের বারান্দাতে নিয়ে আসতে। চেয়ার এলে স্নিগ্ধা বললো, আমরা দুজনে যারা অনিমন্ত্রিত তারা আজ এখানেই খাবো। কী খেতে ভালোবাসেন আপনি?

খিচুড়ি।

সত্যি? তাহলে তো আপনাকে খুশি করা খুবই সোজা। এত খাবার থাকতে শুধুমাত্র খিচুড়ি। ও রান্নাঘরে গিয়ে কী সব বলে-টলে আবার ফিরে এলো।

বললো, রাঁধব আমিই। ভাজাটাজাও আমিই করব। ওদের যোগাড়-যন্ত্রই করতে বলে এলাম শুধু।

কোন্ ডালের খিচুড়ি ভালোবাসেন ?

মুগের ডালের।

দাঁড়ান এক সেকেণ্ড। আমি মসুর ডালের কথা বলেছিলাম। আসছি এক্ষুনি।

স্নিগ্ধা ফিরে এলে চাঁদু বললো, এবার বলো, ষড়যন্ত্রের কথা। তার আগে প্রথমেই আমি একটি কথা বলে নিই। পরশু তোমাকে ডিভোর্সের কথা বলেছিলাম, তা সত্যি হলেও আমার কিছুই এসে যায় না। এবং যায় না বলেই যা বলার তা বলেছিলাম।

বলেই, চাঁদু মুখ নিচু করে ফেললো।

স্নিগ্ধা বললো, কোনো কোনো ব্যাপারে আপনি বেশি লাজুক এবং কোনো কোনো ব্যাপারে বেশি-কম। কিছু কিছু ব্যাপারে ছেলেদের এতো লাজুক হলে চলে না। "উইমেনস্ লিব্" যেদিন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে সেদিনও মেয়েরা কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপাবে পুরুষদের ভূমিকাকে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা বলেই জানবে।

চাঁদু মুখ তুলে বললো, তুমি ডিভোর্সী হলেও আমার চোখে তোমাকে আমার যেমন লেগেছে, তুমি তা না-হলেও তেমনই লাগবে।

স্নিগ্ধা সামনে চেয়েছিলো। কিছু বললো না।

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বললো চাঁদু, আজই মাসিমণির চিঠি পেলাম। ষষ্ঠীর দিনে লেখা। লিখেছেন যে, তোমরা পৌঁছবার পরদিনই ভগাদা আড়ুয়ালপাল্‌কার সাহেবের বাড়ি থেকে মাসিমণিকে ফোন করে বলেছেন যে তোমার ডিভোর্সের কথাটাও নাকি ভগাদার আরেক "ভোগ্‌লা"। মাসিমণি যেন ক্ষমা করেন ওঁকে।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

সত্যি ! ছোড়দাটা না !

তিনি গেছেন কোথায় ?

তা জানি না। তবে বুঝতে পারছি সামথিং ইজ ব্রুয়িং। বিজয়াতে মাকে প্রণাম করতেও আসেনি এ পর্যন্ত। শুক্লাটার অবস্থা ভাবুন। আমার দাদাদের যারা বিয়ে করেছে তাদের অনেক পাপ জমা ছিলো।

আর বোনকে যে বিয়ে করবে ? কেউ তো করবেই। কোনোদিন ? তার ?
চাঁদু বললো।
স্নিগ্ধা বললো, বোনের নজরটাও দাদাদের মতোই উঁচু। এতো বেশি উঁচু এবং আমি এমন জেদী মেয়ে যে হয়তো সেই জন্যেই বোনের বিয়ে হওয়া মুশকিল। হলে তার স্বামীর অবস্থা বৌদিদের চেয়েও খারাপ হবে হয়তো।
জ্যোৎস্নার ছায়া পড়েছিলো বারান্দায় মোটা মোটা থামের। চওড়া বারান্দা জুড়ে। বাগানটাও আলোয় ভাসছে। আলোকিত কামরাগুলি নিয়ে ঝিলিক্ মেরে অতি দ্রুত ঝম্‌ঝম্ করে চলে গেলো কোনো মেইল-ট্রেইন এলাহাবাদের দিক থেকে বানারসের দিকে বাড়ির পেছনের বাগানের লাগোয়া রেল-লাইন দিয়ে। বাড়িটাও যেন কেঁপে উঠলো। একটু পরেই শব্দ মরে গেলো। আবার চুপচাপ। জ্যোৎস্না। ঝিঁঝি ডাকছিল বাগান থেকে। দারোয়ানদের মধ্যে কেউ সুর করে রামায়ণ পড়ছিলো। সেই একটানা তুলসীদাসী রামায়ণপাঠ মিশে যাচ্ছিলো ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে। চাঁদের আলো চক্‌চক্ করছে এখন পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে ; মস্ত বাগানে।
তুমি কি বলবে বলে ডেকেছিলে আজ আমায় ?
হুঁ! তাইই বলব। প্রথম কথা এইই যে আপনার মাসিমণিকে সত্যিই "ভোগ্‌লা" দিয়েছিলো ছোড়দা।
সত্যি! সকৌতুকে বললো, চাঁদু। আর দ্বিতীয় কথা ? ফলসা-রঙা তাঁতের শাড়ি আর হালকা-বেগুনি শাল গায়ে-দেওয়া পাশে-বসা স্নিগ্ধার দিকে চেয়ে!
দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে···
কি ?
কথাটা হচ্ছে, আডুয়াল্‌পালকার সাহেবও যে "চক্রান্ত"র কথা বলছি তাতে জড়িত।
আমার বড়সাহেব ? সে কি ?
হ্যাঁ! আমি জানতে পেরেছি যে উনিই আমাদের শিউপুরায় আসার কথা লিখেছিলেন মাকে। মায়ের চিঠির উত্তরে।
পেটের পক্ষে জল অতি-উত্তম বলেই কি ?
হয়তো তাই। উনি কেন চক্রান্ত করতে যাবেন আমার বিরুদ্ধে। উনি তো খুবই পছন্দ করেন, ভালোবাসেন আমাকে।
চাঁদু বললো।
তারপর বললো, পরিবারের একজনকে দেখেও তো পেটের রুগী বলে মনে

হয় না। তাছাড়া দাদাদের তো সবরকম খাদ্য-পানীয়ের প্রতিই সমান দুর্বলতা।
তা ঠিক।
তাছাড়া অনেক সময় ভালোবাসাও হয়তো চক্রান্ত ঘটায়। আড়ুয়ালপালকারদের সম্বন্ধে আমি অতটা নিঃসংশয় নই।
হয়তো পেট ছাড়াও মানুষের অন্য দুর্বলতা থাকে।
নিশ্চয়ই! থাকেই তো! এমন কোনো রোগ, এমন কোনো দৌর্বল্য যা শুধুমাত্র একজন ডাক্তার ছাড়া আর কেউই সারাতে পারে না। কালি কুয়োর জল, মকরধ্বজ-এর চেয়েও ফলপ্রসূ পৃথিবীর তাবৎ রোগহারী সেই ডাক্তার। রোগের যেমন অনেক রকম হয়, চিকিৎসারও হয়তো হয়।
আমি তো অসুস্থ হয়েইছি। আপনি?
হুঁ। যেদিন থেকে তুমি, মানে তোমরা এসেছো।
রোগটাকে তাহলে খুবই ছোঁয়াচে বলতে হয় বলুন।
স্নিগ্ধা বললো।
নিশ্চয়ই। বললো, চাঁদু। তারপর বললো, আমাকে আর আপনি আপনি করে বোলো না।
নিজের মনে মনে বললো তোমার মুখে প্রথমবার 'তুমি' ডাক শুনে মরে গেলেও দুঃখ নেই।
বলেই, চেয়ারের হাতলে-রাখা স্নিগ্ধার হাতটি তুলে নিলো চাঁদু নিজের হাতে। স্নিগ্ধা বাধা দিলো না। যেমন অক্লেশে কবুতরী কবুতরের বুকে মুখ রাখে, তেমনই অক্লেশে স্নিগ্ধার হাত চাঁদুর হাতে সমর্পিত হলো।
স্নিগ্ধা মুখ নামিয়ে বললো এই কদিন আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি। নিজেকে কারো কাছে এমন করে ছোট করতে হবে কখনওই ভাবিনি জীবনে।
আমিও ভাবিনি। কষ্ট আমিও কম পাইনি।
চাঁদু বললো।
তারপর স্বগতোক্তির মতো বললো, মাথা উঁচু করে বোধহয় জীবনে সবই পাওয়া যায় শুধু ভালোবাসা ছাড়া। এই পাওয়া পেতে হলে সব গর্ব, অহংকার ধুলোয় এমন করে লুটোতে হয় যে আগে জানতাম না। অবশ্য আগে জানবোই বা কী করে? এই ঘটনা তো মানুষের জীবনে বারবার ঘটে না।
তুমি চা কি কফি কিছু খাবে?
"তুমি" শব্দটাতে চাঁদুর সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেলো।
চাঁদু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, আমার তো কেউই নেই। আজ

আমার মা-বাবা বেঁচে থাকলে তোমাকে দেখে, তোমাকে আমার পছন্দ, এ কথা জেনে, খুবই খুশি হতেন।

আমার বাবাও। খুশি হতেন খুব। বাবার সঙ্গে আমি এতো বেশি অ্যাটাচড ছিলাম যে তাঁর মৃত্যুর পর পাগলের মতো হয়ে গেছিলাম। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতো : "ইলেকট্রা-কমপ্লেক্স-এর কেস্"। বাবার অনেক গুণ তোমার মধ্যে দেখতে পেলাম। ভাবলেও অবাক লাগে। যখন কিছু ঘটার নয় তখন পাঁচ-দশ বছরেও ঘটে না। আর যখন ঘটার পাঁচ দিনে কী ভাবে ঘটে যায়!

"লাভ অ্যাট ফারস্ট সাইট" বলে কিছু আছে বলে আধুনিক শিক্ষিত কোনো মানুষ হিসাবে আমিও বিশ্বাস করিনি এতদিন।

স্নিগ্ধা বললো।

চাঁদু বললো, আমিও। কিন্তু তোমাকে মোগলসরাই স্টেশানের প্লাটফর্মে প্রথমবার দেখেই আমার হাত-পা-অবশ হয়ে এসেছিলো। ভগাদা বাইক প্রথম দিকে না চালালে আমি চালাতেই পারতাম না।

স্নিগ্ধা ওর হাত থেকে হাত না ছাড়িয়েই বললো, আমারও সেই অবস্থা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, তুমি কিন্তু ঠকলে চাঁদু। এখনও পথ খোলা আছে। আমার মনে হয় তোমার মাসখানেক সময় নেওয়া দরকার ভেবে দেখার জন্যে।

ভাবাভাবি সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি একটি কলম আর একটি প্যাড নিয়ে এসো তো। তোমার মাকে একটি চিঠি লিখে দিয়ে এই চক্রান্ত শেষ করে দিয়ে যাই।

কী লিখবে?

ফর্ম্যাল প্রোপোজাল। লিখব "হেমমাসি, আমি আপনার পরমা সুন্দরী, অশেষ গুণবতী কন্যার যোগ্য নই যদিও তবুও আমি তার পাণিপ্রার্থী।"

আহাঃ। বেশি বিনয়! না। নিজেকে ছোট করবে না। লেখার দরকার নেই। তুমি ভাবো আরো।

আর তুমি?

আমার তো "হয়ে গেছে যা হবার এ জনমের মতো।" তুমি "না" বললে বিন্ধ্যাচলের কোনো আশ্রমেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবন যদি তুমি রানীওয়াড়াতেই থাকো। মাঝে মাঝে তবু তো দেখতে পাবো তোমাকে!

এমন সময় বাইরে একটি মোটর-সাইকেলের ভটভটানি শোনা গেলো। তারপরই ভগাদার কণ্ঠস্বর।

কোথায় রে সেই মীন, রাসকেলটা। অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে এসে আমার বোনের সঙ্গে প্রেম করছে ? **sneaky, evil, rascal !**

অবশ্য সবই বলছিলো ইংরিজিতেই !

ভগাদার গলা শুনেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসলো দুজনে।

আপনি গেছিলেন কোথায় ? দু'দিন ?

কেন ? ভাড়া চাইবি নাকি মোটর সাইঁকেলের ?

চাইতেও পারি।

যে-অন্যায় তোরা নাকের সামনে দুবেলা সহ্য করেছিস কিন্তু যার প্রতিকার করার সাহস তোদের ছিলো না তাইই করে এলাম। হোসেন সাহেবের যোগসাজসে মৌলবী সেজে, বিন্দিয়াকে বোরখা-পরানো বিবি সাজিয়ে সোজা এলাহাবাদে ভরতের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। সেই মিলনের দৃশ্য যদি দেখতিস তো তোদের এই টীপিক্যাল নেকু-নেকু বাঙালী মিলন ম্লান হয়ে যেতো। সে কী কান্না। কাঁদতে কাঁদতে দুজনেরই কফ বেরিয়ে গেলো। দুস্‌স্ শালা ! যাকে বলে রিয়্যাল প্রেম ! তারপর ডাকো ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। জোগাড় করো সাক্ষী। অবশ্য আসল সাহায্য করেছিলো আড়ুল। ওর সাহায্য ছাড়া কিছুই হতো না। ওখানেও পুলিশকে ইনফর্ম করা ছিলো। সোজা মুসৌরী পাঠিয়ে দিয়েছি এলাহাবাদ থেকে হানিমুনে। টাকা পয়সাও দিয়ে দিয়েছি। বলেছি, পরে শোধ করে দিতে। ব্যাঙ্ক তো বন্ধ ছিলো দশেরার দিন। ভরতের বাড়িতেও টাকা ছিলো না। দুজনেই ফোনে কথা বলেছে ঝাঁজীর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আজ রাতে মুসোরী পৌঁছে।

ঝাঁজী রাগ করবেন না ?

চাঁদু শুধলো।

ইডিয়ট্। শুধু শুনেছো কি মুখেরই বারতা ? শোনোনি কি অন্তরের কতা ? তোর বাড়ি যেদিন গান-বাজনা হলো সেদিন রাতে আমি আবার গেছিলাম তো এই জন্যেই। একমাত্র মেয়ের এই অবস্থা কোন্ বাবা-মায়ে সহ্য করেন ? শুধু সমাজের ভয়ে, লোকের ভয়ে কাঁটা হয়েছিলেন দুজনে। আমাকে বললেন, আমার প্রস্তাব শুনে, এতদিনে একজন মরদের বাচ্চার দেখা পেলাম।...। ছিঃ ছিঃ চাঁদু। যে কাজটা তোরা কবে করতে পারতিস তা আমাকে করতে হলো টোরোণ্টো থেকে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসে। একে কি ছুটি কাটানো বলে !

কেন ? অন্য অনেক কিছুই তো করলেন ?

কী ?

যেমন শিকার।

ইয়ার্কি মারবি না। তোর মতো আনলাকি সঙ্গীর সঙ্গে গেলে ওরকমই হয়।

অনেক শিকারের গল্পই পড়েছি, কিন্তু আপনার মতো ফোঁড়া আর মোটর-সাইকেল শিকারীর কথা কোথাওই পড়িনি আজ অবধি। তাছাড়া, শুধু কি বিন্দিয়ার বিয়েই দিতে এসেছিলেন?

দ্যাখ্ চাঁদু। পড়েছিলি তো এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর রানীওয়াড়াতে। আডুল্ না থাকলে আমরা তোর কথা জানতেও পারতাম না। আমার বোনের মতো এমন রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বর খোঁজ পেতিস তুই এই গর্তেই বসে? বেচারী কিরণমাসি! আমি শালা চিরজীবন পরের ভালো করতে গিয়েই 'ভগা' নাম কিনলাম। নিজের কারণে, মাইরি বলছি, কাউকে জীবনে কখনও ভোগলা দিইনি।

চাঁদু হেসে উঠলো। স্নিগ্ধাও হাসছিলো নিঃশব্দে। ভগাদা ধমকে বললেন তোদের ভাবখানা এমন, যেন বিয়ে হয়েই গেছে। এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো। আহা রে! যা সিনু! ওঠ্। দ্যাখ্ তো পগাটা কোথায় হুইস্কিটা লুকিয়ে রেখে গেছে।

স্নিগ্ধা উঠে চলে যেতেই, ভগাদা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গিয়ে চাঁদুর দিকে ডানহাত প্রসারিত করে বললেন, চাঁদু। কন্‌গ্রাচুলেশানস্! আমাদের মেয়ে যদিও খুবই ভালো, তুইও ওর চেয়ে একটুও খারাপ নোস। দা হোল ফ্যামিলি ইজ প্রাউড, ভেরি মাচ প্রাউড ইনডিড ট্যু হ্যাভ উ্য অ্যাজ ওয়ান অফ্ আস্।"

বলেই, চেঁচিয়ে বললেন, সিনু, তুই দরজার আড়াল থেকে লুকিয়ে ওসব না শুনে দয়া করে যা বললাম তা কর তো! ভীষণ টায়ার্ড আমি। দু দুটো বিয়ে পাকিয়ে ফেললাম। টন্‌টন্ করছি একেবারে। ফাটা-ফোঁড়ার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাকাতর আমি এখন!

চাঁদুকে বললেন, চল্ বাইরে গিয়ে বসি। এখন তো আর নেকু-পুষু-মুনু প্রেম করা চলবে না। বাসর-ঘরে কোরো। অনেকদিন পড়ে আছে। গার্জেন এসে গেছে। আর শোন্ তোর এই আপনি-আজ্ঞে এবার বন্ধ কর। আমি আর পগাও তো তোর আপন দাদাই হলাম, না কি?

চাঁদু কিছু বললো না। ভগাদা বারান্দায় গিয়ে দারোয়ানদের ভেতর থেকে চেয়ারগুলো নিয়ে আসতে বললেন।

তারপর বললেন, তুই খুশি হয়েছিস তো চাঁদু?

মাথা নাড়লো চাঁদু।

খুব খুশি তো ? পরে বুঝবি যে, কত্ত বড় সর্বনাশ তোর করে দিলাম। দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া উ পস্তায়া, যো নেহি খায়া উওভি পস্তায়া। একজন পুরুষ হয়ে অন্য পুরুষের এতো বড় সর্বনাশ আর করা যায় না। যে শালা বিয়ে করেছে তার হয়ে গেছে। সবাই তো আর ভগা নয় যে, আগের মতোই বাঁচতে পারবে ? আমার বোনই হোক আর যেই হোক, মেয়েছেলে তো ! ছ্যাঃ ! কিন্তু তোকে বাঁচাই আমার এমন সাধ্য কী ? তুই যে সকল লিয়ে বসে আছিস সব্বোবাঁশের আশায় !

ভগাদা বললেন, 'দাঁড়া চাঁদু। এক সেকেণ্ড। চান করে আসি। ওরে ও মগনলাল না ভগনলাল বাথরুমে একটু গরম জল দে বাবা !

ভগাদা চলে যেতেই একটি ট্রের উপর হুইস্কির বোতল রেখে, ঠাণ্ডা জলের বোতল এবং দুটি গ্লাস নিয়ে এলো স্নিগ্ধা। যেন জানে না, এমন ভাবে বললো ছোড়দা কোথায় গেল ?

চান করতে।

এ বারান্দায় অন্ধকার। স্নিগ্ধা বললো।

ভালোই তো। পাশে এসে বসো। তুমিই তো আলো !

তুমি কি এখনই হুইস্কি খাবে ?

না। ভগাদা এলে।

চাঁদু আবার স্নিগ্ধার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো। খুব কাছে এখন স্নিগ্ধা। পারফ্যুমের গন্ধ পাচ্ছে। স্নিগ্ধ। তীব্র নয়। স্নিগ্ধার শরীর অথবা মন, সাজ অথবা ব্যবহারে কোথাও তীব্রতার রেশ নেই। ওর সমস্তটুকু সত্যিই কড়িমাতে বাঁধা।

স্নিগ্ধার হাতে হাত রেখে চাঁদের আলোয় ভেসে-যাওয়া সামনের বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলো চাঁদু।

"She ! She !
Like a visiting sea !
Which no door could ever restrain !"

স্নিগ্ধা, চাঁদুর হাতটি নিয়ে নিজের গালে ছোঁয়ালো।

মায়ের এবং বাবার কথা মনে পড়লো চাঁদুর। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। ওঁরা থাকলে, আজকের আনন্দের ভারের অনেকখানিই ওঁরাই বইতেন। হয়তো বইতেন, স্নিগ্ধার বাবাও। স্নিগ্ধার আসা এবং ওঁদের চলে-যাওয়ার

ক্ষণগুলির উপরে ওর নিজের তো কিছুমাত্রও ক্ষমতা ছিলো না নিয়ন্ত্রণের !

স্নিগ্ধা বললো, কি ভাবছো ?

চম্‌কে উঠে, স্নিগ্ধার হাতে নিজের হাতের মৃদু চাপ দিয়ে স্নিগ্ধার শরীর মনের সবটুকু উষ্ণতা ওর শীতার্ত শরীরে সঞ্চারিত করে দিলো । আশ্চর্য ! এতো শীত যে জমা ছিলো ; কখনও জানেনি আগে ।

কি ভাবছো ? তুমি ?

চাঁদু ভাবছিলো ; তিরিশটা বছরের অসম্পূর্ণতা এই শুভমুহূর্তে সম্পূর্ণতার মহিমায় এই চাঁদ-ভাসি রাতেরই মতো মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠলো ।

এমন চুপ করেই থাকবে বুঝি ?

প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর জীবনেই দেবদুর্লভ কিছু মুহূর্ত আসে, যখন কথা বলে যতটুকু বলা যায় ; কথা না-বলে হয়তো বলা যায় তার চেয়ে অনেকই বেশি ! ঠিক্ না ?

হুঁ !

স্নিগ্ধা বললো, গাঢ় স্বরে ।

পুজোর পরের হিমের পরশ-ভরা রাতে পাহাড়ের উপরে নাম-না-জানা একজোড়া রাতপাখি জড়াজড়ি করে সুখের ডানা মেলে উড়ে যেতে যেতে চম্‌কে চমকে ডাকছিলো বার বার । পাখিদের ভাষা ; পাখিরাই জানে । ওরা দুজনও পাখি হয়ে গেলো, নীড়ের পাখি ; জোড়ের-পাখি । আদিগন্ত জীবনের দুঃখ-সুখের আকাশে ভাসা সবে শুরু হলো ওদের ।

॥ শেষ ॥